ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ।। ১১ পৌষ, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২৭ ডিসেম্বর ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

পশ্চিমবঙ্গে সত্তর দশকের পদধ্বনি

অঘোষিত খতমের রাজনীতি চলছে

গূঢ়পুরুষ।। চার দশক পরে পশ্চিমবঙ্গে হিংসার ও প্রতিহিংসার রক্তাক্ত রাজনীতি ফিরে এসেছে। সিপিএম বিনা রক্তপাতে ক্ষমতা ছাড়বে না। প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল পাল্টা সন্ত্রাস চালিয়ে ইঁটের জবাব পাথরে দিচ্ছে। কোনও পক্ষই ইঁটের জবাবে 'রসগোল্লা' ছুঁড়তে প্রস্তুত নয়। কম্যুনিস্টরা নীতিগতভাবে হিংসায় বিশ্বাসী। তাত্ত্বিকভাবে মার্কসবাদে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থান নেই। ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের স্বার্থে মার্কসবাদীরা গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। রাজনৈতিক হিংসা ও পার্টির শত্রুর রক্তপাত কম্যুনিস্ট মতাদর্শে অদ্ভুত নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই রাজ্যে সিপিএম বিনা রক্তপাতে মহাকরণ ছাড়বে না। গত ৩৪-৩৫ বছর টানা ক্ষমতায় থাকার সুবাদে সিপিএম পার্টির সংগঠন এখন অস্ত্রশক্তিতে যথেষ্ট শক্তিশালী। বিধানসভার নির্বাচনের আগে ও পরে শত্রু হত্যায় পার্টির হার্মাদরা তৎপর থাকবে সে কথা না বললেও চলে। সিপিএম লাল পতাকা ও লাল রক্ত দুইই পছন্দ করে। স্বৈরাচারী এই পার্টির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এলে দল যে কতটা নৃশংস এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখন সেটাই দেখছেন।

খুনের রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসও পিছিয়ে নেই। অস্ত্রশক্তিতে সিপিএমের সমকক্ষ না হলেও যথেষ্ট শক্তিধর। এই অস্ত্রবলেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় তৃণমূল এখন অধিকার কায়েম করেছে। একইভাবে সিপিএম পশ্চিম মেদিনীপুরকে পার্টির একচ্ছত্র কবজায় রেখেছে। প্রতিযোগিতা চলেছে কে কটা লাশ ফেলতে পারে, মাওবাদী, মার্কসবাদী, তৃণমূল সকলেই এখন অঘোষিত খতমের রাজনীতি করছে। সত্তরের দশকে ঠিক এইভাবেই নকশাল, সিপিএম এবং কংগ্রেস খতমের রক্তস্নাত

(এরপর ৪ পাতায়)

লাশ নিয়ে রাজনীতি : মরদেহে মাল্যদানের প্রতিযোগিতায় বুদ্ধ-মমতা।

সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের নতুন কৌশল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'হার্মাদদের মদত দিচ্ছে আর এস এস'— এই শিরোনামে গত ১২ ডিসেম্বর দৈনিক স্টেটসম্যানের প্রথম পাতায় জনৈক সাংবাদিকের নামে প্রকাশিত এক সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছিল— জঙ্গলমহলে সিপিএম ক্যাডার বাহিনীর হানার সময় আর এস এস কর্মীরাও সঙ্গে থাকছেন। ওই সংবাদে আর এস এসের দক্ষিণবঙ্গের প্রচার প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়-এর বক্তব্যও উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, জঙ্গলমহলে তাদের কোনও সংগঠনই নেই। এসব কল্পিত খবর। যে সকল নাম প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে সেই নামে কোনও স্বয়ংসেবক নেই বলেও শ্রী চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

এরপর আবার উনিশে ডিসেম্বরে ওই কাগজের সেই সাংবাদিককে এর পরিপ্রেক্ষিতে 'টেলিফোনে অনবরত প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে' বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশিত এই সংবাদের প্রতি আর এস এসের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক (সভাপতি) অতুল বিশ্বাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান— এইসব হুমকির

(এরপর ৪ পাতায়)

বিদেশী অর্থ প্রাপ্তির শীর্ষে খৃস্টান মিশনারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। খৃস্টান সংগঠনগুলিই সব থেকে বেশি বিদেশী অনুদান পেয়ে থাকে। ভারতের এন জি ও বা বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য পেয়েছে। বিদেশ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির তালিকায় দাতা ও গ্রহীতা উভয় ক্ষেত্রেই খৃস্টান সংগঠনগুলি শীর্ষস্থানে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও জার্মানী— এই তিনটি দেশ দাতাদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুসারে এদেশে ফরেন কন্ট্রিবিউশান রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুমোদিত ৩৪, ৮০৩টি এন জি ও কাজ করছে। ভারতে সক্রিয় এইসব এন জি ও-র মধ্যে ১৮, ৭৯৬টি সংগঠন ৯ হাজার ৬৬৩.৪৬ কোটি টাকা ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সাহায্য হিসাবে পেয়েছে। সব থেকে বেশি সাহায্য প্রাপ্ত রাজ্যটি হলো দিল্লী। প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ১ হাজার ৭১৬.৫৭ কোটি টাকা। এর পরেই রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ (১,১৬৭.২১ কোটি টাকা) এবং তামিলনাড়ু ১৫৭০.৯৩ কোটি টাকা)।

বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত শীর্ষে থাকা খৃস্টান-মিশনারীদের সমর্থিত সংগঠনগুলির মধ্যে

(এরপর ৪ পাতায়)

ছোটোদের মধ্যে বই-সংস্কৃতি গড়ে তোলার গরজ নেই কারও

রমাপ্রসাদ দত্ত।। বইপাড়ায় কলেজ স্ট্রিট মোড়ে একটি পত্র-পত্রিকার দোকানে পোস্টার ঝুলছে দেখলাম ক'দিন আগে। লেখাগুলো মনে ধাক্কা দিল। 'ছোটোদের মধ্যে বই-সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিতে হবে।' একথা আমরা বারবার বলছি। যে-কোনও ক্ষেত্রে এগোতে হলে পুরোপুরি তৈরি হওয়া চাই। বই প্রধান সহায়ক সবসময়। বড়োদের ভূমিকা উৎসাহদাতার। বই-এর জন্যে ব্যয় অপব্যয় নয়। বই-সংস্কৃতি জীবনে মর্যাদা পাক।' লেখার সঙ্গে ছবি আছে ছোটোদের। তারা বই দেখছে।

বইপাড়ায় এধরনের পোস্টার টাঙানো হলেও বই-সংস্কৃতি নিয়ে আন্তরিক ভাবনা বইপাড়ায় কতটা? ছোটোদের বই যাঁরা প্রকাশ করেন তাদের ক'জনের কাজে আন্তরিকতা, সততা এবং ভালোবাসা আছে? তাদের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য যেকোনও ভাবে কতটা বেশি টাকা কামিয়ে নেওয়া যাবে সেদিকে। ছোটোদের জন্য দু'রকম বই থাকে। স্কুলের পাঠ্য বই আর আনন্দে পাঠের বই। স্কুলের পাঠ্য বই নিরানন্দের বই-এমন কথা বলবো না। তবে সেসব বই যেভাবে তৈরি হয় তাতে ছোটোরা আনন্দ পায় না। আনন্দ পান প্রকাশক, লেখক আর শিক্ষকেরা। কারণ তাঁদের আমদানির অঙ্ক জড়িয়ে আছে বইয়ের বিক্রির সঙ্গে। সেসব বই যত্নে তৈরি হলে ছোটোরা হয়তো একটু আকর্ষণ খুঁজে পেত। কিন্তু তা করাতে গেলে লাভের পরিমাণ কমার সম্ভাবনা বলে প্রকাশকরা ওসব নিয়ে ভাবতে নারাজ।

নন-টেক্সট বই বা আনন্দ পাঠের জন্য যেসব তৈরি হয় তার বিক্রি কম। প্রকাশকদের মধ্যে অধিকাংশই এক্ষেত্রে হৃদয়হীন বাণিজ্যসর্বস্বতার পরিচয় দেন। সেই বাণিজ্যে রয়েছে শুধু মুনাফার দিকে দৃষ্টি। যেমন-তেমন ভাবে লেখা আঁকা ছাপা বাঁধাই করা বাজারে আসছে। সেসব বই বিক্রির নানান কৌশল আছে। 'কাটাকুটির বই' মেলে বইপাড়ায়। বইয়ে দাম লেখা আছে একশো টাকা। সেখানে বই-বিক্রেতারা ছাড় পাবেন পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ। বইটা বিক্রেতা বিক্রি করবেন ক্রেতাকে আশি নব্বই টাকায়। ক্রেতা নিয়ে গিয়ে ভাববে খুব ভালো বই এনেছি। বইপত্র যাঁরা দেখেন নিয়মিত, ভিতরের বস্তুর খোঁজখবর রাখেন তাঁদের কাউকে দেখালে বলবেন, 'এসব বই কিনে ছেলেমেয়েকে দেওয়ার মানে বাজে পচা খাবার দেওয়া। বাজারে ভালো বইও তো পাওয়া যায়। একটু বেশি দাম দিয়ে কিনতে তো পারতেন?'

এদিকে গ্রন্থরুচি গড়ে ওঠাতে নানারকম -ভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে বইপাড়া-ই বহুধরনের বাজে জিনিস বাজারে ভর্তি করে ফেলছে। ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলেছে অঙ্ক কষে। বিভিন্ন জেলায়- জেলায় ওই ধরনের বইয়ের বাজার ভালো। ক্রেতারা কম পয়সায় পান। সরকারি লাইব্রেরির লোকজন এসে বইবিক্রেতাদের সরাসরি বলেন, 'হাতে কত দেবেন? পাতে কত দেবেন?' তার মানে নগদ টাকা কত দেবেন বই-এর কমিশনের অংশ থেকে? আর ক্যাশমেমোতে কত ছাড় দেবেন?' পুস্তক বিক্রেতা বলেন, 'হাতে দোব পনেরো, পাতে দশ।' গ্রন্থাগারকর্মীরা রাজায় রাজি হয়ে যান। পুস্তক বিক্রেতা পঁচিশ শতাংশ ছাড়ে বই বেচে দেন। যেসব বই

এনেছেন ৬০ শতাংশ ছাড়ে। প্রকাশক নিজে থাকলে লাভ তো আরও বেশি। এর ফল কি দাঁড়াল? সরকারি টাকায় বাজে বই কিনে লাইব্রেরির তাক ভর্তি হলো।

বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ছোটোদের বিভাগ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। সেজন্য অর্থবরাদ্দও রয়েছে। কিন্তু ছোটোদের কি ধরনের বই পড়ার উৎসাহ দেওয়া হবে সে ব্যাপারে কোনওরকম নির্দিষ্ট নীতি-নিয়ম নেই। গ্রন্থাগারকর্মীরা যদি ছোটোদের এবং বইকে ভালোবাসতে না পারেন তাহলে তাঁরা গ্রন্থাগারে ছোটোদের ডাকবেন কীভাবে? ছোটোরা আকৃষ্ট হবে কিসের টানে? পরিকল্পনা হয়েছিল খেলার ছলে পড়ার। খেলনা থাকবে। থাকবে নানারকম সুন্দর বই। যার লেখা আঁকা ছাপা কাগজ বাঁধাই— সব ছোটোদের মনপসন্দ হবে। বইগুলোর একটুও ধকল সহ্য করার ক্ষমতা থাকবে। যেকোনও বইয়ের একাধিক কপি থাকা দরকার। ছোটোদের বই পড়ে শোনাতে হবে। তাদের পড়তে উৎসাহ দিতে হবে একটুও বকাবকি না করে। তারা ছবি আঁকবে লিখবে। বোর্ড থাকবে। সেখানে নিজেদের আঁকা লেখা আটকে দেবে। গ্রন্থাগারিক ছোটোদের উৎসাহ দেবেন সবসময়। তাদের বন্ধু-দিশারী হয়ে থাকবেন ভালোবাসা ছড়িয়ে। ছোটোদের বই থাকবে নিচু তাকে। তারা নিজেদের নাগালে যেন পায়। বইয়ের আলমারির উচ্চতা চার ফুটের বেশি উঁচু হবে না। কোনও দরজা বা পাল্লা থাকবে না। ভালো কাঠের বা স্টিলের হবে, যাতে পড়ে না যায়। ছোটোরা তাকে গিয়ে বই বেছে নেবে। বই গুছিয়ে রাখতে শিখবে তারা লাইব্রেরিতে। তাদের পড়ার টেবিল চেয়ার হবে অন্যরকম। উঁচু হবে না। টেবিল বা টুল বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ছোটোদের জন্যে অডিও ভিস্যুয়াল বা দৃশ্য- শ্রাব্য কিছু জিনিস থাকবে। তারা গান শুনবে, ছবি দেখবে। অনেক ছবি টাঙানো থাকবে। ঘরের জানালা দরজা দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস আসা চাই। ঘরের বাইরে কিছু গাছ রাখতে পারলে ভালো। ছোটরা লাইব্রেরিতে ঢুকে যাতে আনন্দ পায়— সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

এতসব ভাবনা নিয়ে কাজ করতে বাড়তি টাকা লাগে না। প্রয়োজন হয় ভালোবাসা। আন্তরিক ভাবনা। ছোটোরা খুবই অনুভূতিপ্রবণ। বড়োদের মতো তারাও ভালোবাসা মর্যাদা চায়। তাদের জন্যে সেই জিনিসটা যদি লাইব্রেরিয়ান দিতে পারেন তাহলে গ্রন্থাগার হয়ে উঠবে ছোটোদের আনন্দের হাট। কিন্তু বেশীরভাগ গ্রন্থাগারিক বা তাঁর সহকর্মীরা ছোটোদের অবাঞ্ছিত ভাবেন। তারা না এলেই ভালো। এলে বেশি কাজ করতে যেন না হয়। এইরকম মনোভাব বেশিরভাগ গ্রন্থাগারে দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে ছোটোদের বিভাগ আছে।

রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যখন প্রথম গড়ে উঠেছিল তখন ছোটোদের জন্যে চমৎকার আয়োজন ছিল। বি টি রোডের মরকতকুঞ্জের সেই বাড়িতে ছোটোদের লাইব্রেরি যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু অনিচ্ছুক কর্মীরা চাইতেন না সব চলুক ঠিকভাবে। তাঁরা ছোটোদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করলেন মতলব এঁটে। ছোটোরা আসতে চাইল না আর। বিভাগটা বন্ধ হয়ে গেল। অনেক বছর রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নতুন বাড়ি হলো কাঁকুড়গাছিতে। সেখানে ছোটোদের জন্যে বিরাট জায়গা বরাদ্দ হয়েছিল। ছোটোরা লিফটে উঠবে বই পড়তে। তারা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পারে। পূর্বনির্মাতাদের বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন গ্রন্থাগারিক,

(এরপর ৪ পাতায়)

বিরোধীদের অনৈক্য হলেও সিপিএম ক্ষমতাচ্যুত হবেই

নিশাকর সোম।। এ রাজ্যের বিভিন্ন নেতা-নেত্রীরা যা বলছেন তার প্রয়োগ যদি হয় তবে এ রাজ্যে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর সাম্প্রতিক বক্তৃতার এক বুলি— "হয় বামপন্থা— না হয় মৃত্যু।" এ যেন কিউবার নেতার কথার বুলি কপচানো হচ্ছে, যেটা যুবকদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টির এক প্রচেষ্টা। যদিও বামপন্থার গঙ্গাযাত্রা বুদ্ধবাবু তথা সিপিএম বেশ যত্নসহকারে এবং সুচিন্তিতভাবে করেছেন। ১৯৬৪ সালে সিপিএমের প্রতিষ্ঠার বছরে পার্টি কংগ্রেসে যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল তাতে স্ট্রাটেজি অর্থাৎ রণনীতি ঠিক হয়— "শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তি সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ— একচেটিয়া পুঁজি- বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব।"

এই কর্মসূচিতে প্রথম ধাক্কা লাগে ১৯৬৭ সালে রাজ্যের প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে। সেদিন বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা তথা প্রাক্তন স্পীকার ও অর্থমন্ত্রী শৈল মুখার্জি বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমি হাওড়ায় সিপিএম-এর পোস্টার দেখেছি। লেখা আছে— নির্বাচন শেষ কথা নয়, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে চল। আমি খুশি হয়েছি যে— সিপিএম 'ভয়োরের খোঁয়াড়ে' ঢুকে পড়ছে।" এইভাবেই ধীরে ধীরে তথাকথিত 'বামপন্থার' গঙ্গাযাত্রা শুরু। স্পেকট্রাম দুর্নীতির কালা ঘাঁটতে গিয়ে শোনা যাচ্ছে, এরাজ্যের শিল্প সচিব সব্যসাচী সেনও নাকি রাডিয়ার সঙ্গে 'পরিচিত' ছিলেন এবং তার পিছনে ছিল টাটা। আর সিপিএম তো আজকে টাটা-মিত্তলদের পদসেবা করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের' চিতাভস্ম উড়িয়ে দিয়েছে। তাই শত চেষ্টাতেও পার্টির শুদ্ধিকরণ হতে পারে না। কারণ আজকের সি পি এম-এর দর্শন হলো—'খাও-পিও-মজা কর'।

সম্প্রতি আর এস পি-র "বিপ্লবী-নেতা" তথা রাজ্যের ব্যর্থ পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী বলেছেন, "সিপিএম-এর অবক্ষয়ী কর্মীদের বাদ দিয়ে বিপ্লবী মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে।" খবরে প্রকাশ, ক্ষিতি গোস্বামী ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রবীণ নেতা অশোক ঘোষকে বলেছেন যে, আর এস পি-ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সংযুক্তিকরণ করে এক পার্টিতে পরিণত করা হোক।

এর মানে হলো নিজস্ব গোষ্ঠী বজায় রাখতে নিজের আর এস পি পার্টিকে প্রায় তুলে দিয়ে এখন ফরওয়ার্ড ব্লক-কে অবলম্বন করতে চাওয়া। আসলে ক্ষিতিবাবু নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনাময় একটি কেন্দ্রের জন্য সিপিএম-এর উপর চাপ সৃষ্টি করছেন।

ব্যারাকপুর অঞ্চলের সভায় বিমান বসু-বুদ্ধবাবু বলেছেন, এত মাতব্বরি কেন? হম্বিতম্বি কেন? হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে হবে। সভায় তড়িৎ তোপদার উপস্থিত ছিলেন। সংবাদসূত্র বলছে, তড়িৎবাবু জুট রিসার্চ কেন্দ্রের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে চড় মেরেছিলেন। তখন জ্যোতিবাবু তাঁকে ক্ষমা চাইবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তড়িৎবাবুর এলাকার একাধিক নেতৃস্থানীয় কর্মী বলছেন যে তড়িৎবাবুর ছেলের বিয়েতে নাকি 'ভালবেসে' একজন বিনা পয়সায় মাছ সরবরাহ করেছিলেন। এরা কে বা কারা? শুদ্ধিকরণ এভাবেই হচ্ছে, হবেও!

কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণার বৃদ্ধ দুমন্ত নেতাদের আর কর্মীরা চান না। তাই কলকাতায় দীপক সরকার, গৌতম দেব-কে চাইছেন কর্মীরা। এক জনসভায় তৃণমূলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি, খুড়ি তিনি তো মুসলিমদের খুশি করতে ব্যানার্জি পরিত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেছেন— বলেছেন, "জো হামসে টকরায়গা চুরচুর হো যায়গা"। এই হলো নেত্রীর নীতি। তিনি বিরোধীদের (পড়ুন কংগ্রেস সহ) চুরচুর করে দেবেন— তাঁর বিরোধিতা চলবে না। তেমনি সিপিএম-এর 'অ্যাকশনে'র নেতা দীপক সরকার বলেছেন— "তৃণমূল বোমা ছুঁড়লে আমরা কি রসোগোল্লা ছুঁড়বো? আমার মেদিনীপুর মুক্ত করে ফেলা চাই-ই।"

অন্যদিকে আবার মুর্শিদাবাদ-এ তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে— অধীর চৌধুরী আর মমতা। মমতা প্রথমে কল্যাণ ব্যানার্জি-কে দিয়ে অধীরকে সমালোচনা করিয়েছেন। পরে মমতা সাগরদীঘির জনসভায় বলেছেন, 'আমি কথা দিলে সভায় আসি। আমার তো হেলিকপ্টার নেই।' ইঙ্গিত প্রণব মুখার্জির না-আসা। প্রণববাবু অধীর চৌধুরীকে খুশি রাখতে সভায় আসেননি। মমতা এই অনুষ্ঠানে (সরকারি অনুষ্ঠান) তাদেরকে "হার্মাদ-গুন্ডা" বলে নিন্দা করেছেন। (উল্লেখ্য অবিভক্ত রাজ্য কংগ্রেসে এক সময় মমতা অধীর চৌধুরীর সম্বন্ধে বলেছিলেন 'সমাজ বিরোধী'।) অধীর চৌধুরী কল্যাণ ব্যানার্জি-কে কাকতাড়ুয়া, পায়ের তলায় বসে রাজনীতি করে বলে ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। আবার তৃণমূল-এর দৈনিক মুখপত্রে বলা হয়েছে— তৃণমূল উত্তরবঙ্গ জয় করেছে! অর্থাৎ কংগ্রেস-কে বাদ দিয়ে তৃণমূল এককভাবে নির্বাচনে 'লড়াই করার' ব্যবস্থা নিয়েছে। কংগ্রেসকে টাইট দেবার জন্য তৃণমূল নেত্রী সবং-এ এস ইউ সি-কে সিটটি দিয়ে দিচ্ছে। যদি কংগ্রেস-এর সঙ্গে ঐক্য হয় তখনও কংগ্রেস প্রার্থীদের ক্ষেত্রে 'গোঁজ'-এর অভাব হবে না।

একটা কথা উল্লেখ না করে থাকা যাচ্ছে না। এন ডি এ সরকারের আমলে 'কফিন কেলেঙ্কারী'-এর কথা তুলে মমতা এন ডি এ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। এখন তো ভারতের সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারীতে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা কোটির কেলেঙ্কারী ফাঁস হয়েছে। তাহলে মমতা কি ইউপিএ ত্যাগ করবেন? নাকি চাপ দিয়ে কংগ্রেস-এর কাছ থেকে বেশি সুবিধা আদায় করবার ব্যবস্থা করবেন।

সততার প্রতীক-ই বটে!

'বিপ্লবী' ক্ষিতিবাবু বলুন তো— আপনাদের রাজ্য কমিটির দপ্তর ক্রয়ের জন্য টাকা কোথা থেকে এসেছিল? যতীন চক্রবর্তী বহিষ্কৃত হবার পর অনেক সাংবাদিককে বলেছিলেন— রিপন স্ট্রিটের ক্রান্তি প্রেসের বাড়িটির বিপুল অর্থব্যয় কি করে হলো? সবই কি জনসাধারণ দিয়েছেন? ক্ষমতার মধুটা খাব কিন্তু মৌমাছির হুল সহ্য করতে পারছেন না?

শোনা যাচ্ছে, মহাশ্বেতা দেবী, কবীর সুমন, পল্লব কীর্তনিয়া, সুজাত ভদ্র, শুভাপ্রসন্ন প্রমুখরা তৃণমূলের ছায়া ত্যাগ করে একটি পৃথক সত্তা হিসাবে চলতে চাইছেন। তাঁরা সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বিশ্বাসী। যতই সিপিএম বনাম বিরোধীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হোক না কেন সিপিএম ক্ষমতা থেকে চলে যাচ্ছে— এটা ধ্রুব সত্য। সিপিএম-নেতৃত্ব নিজেরা এটা বুঝেছেন এবং তার মতোই তৈরি হচ্ছেন। যাতে অন্ততপক্ষে ১০০টা সিট জেতা যায় তার জন্য তারা সমীক্ষা শুরু করেছেন এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এই সময়

ইউরোপেও ২৬/১১

২৬/১১-কে মদত দিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ৯/১১-কে রোখার ওবামা-নীতি যে ভ্রান্ত, বরং এতে করে পাশ্চাত্যে ২৬/১১-রই সম্ভাবনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে— একথা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন বৃটিশ গোয়েন্দারা। গোয়েন্দা-সূত্র উদ্ধৃত করে লন্ডনের সানডে টাইমস জানিয়েছে, আল কায়দার মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিস্ট ইলিয়াস কাশ্মীরী ইংল্যান্ডে ২৬/১১-র কায়দায় আক্রমণ শানানোর জন্য খোদ বৃটিশ যুবকদেরই 'রিক্রুট' করছে এবং তাদের প্রশিক্ষণও দিচ্ছে এব্যাপারে। তবে শুধু ইংল্যান্ডে-ই নয়, ক্রীসমাসের সময় ফ্রান্স এবং জার্মানীতেও এধরনের হামলার পরিকল্পনা করেছে তারা। সানডে টাইমস-এর মন্তব্য— পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের খুজি জঙ্গি গোষ্ঠী-ই আগামী দিনে ইসলামী দুনিয়ায় নতুন ওসামা বিন লাদেন রূপে উদিত হতে চলেছে।

জাল ডিগ্রি

ভারতের মুম্বাইয়ে ২৬/১১-এর ঘটনায় অভিযুক্ত সাত পাকিস্তানী'র বিচার-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নিল গত ১৮ ডিসেম্বর। ওইদিন ইসলামাবাদের স্থানীয় আদালতে সরকারপক্ষের আইনজীবী জানান, অভিযুক্তদের আইনজীবীদের মধ্যে একজনের আইনের ডিগ্রী ভুয়ো। তাই অবিলম্বে ওই আইনজীবীকে বহিষ্কার করা হোক। স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছে তদন্ত। তথ্যাভিজ্ঞ মহল এনিয়ে পূর্বাপর অভিজ্ঞতা থেকেই সরকার পক্ষের আইনজীবী-র বক্তব্য কোনওমতেই উড়িয়ে দিতে পারছে না। ২৬/১১-নিয়ে বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য সন্ত্রাস দমন প্রশ্নে পাকিস্তানের 'আন্তরিকতার'ই অন্যতম অঙ্গ হিসেবে এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

ভারতের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ, ছায়া-যুদ্ধ, ঠাণ্ডা-যুদ্ধ কিংবা কূটনীতির খেল— ভারতের বিরুদ্ধে সবকিছুই ফেল মারছে বুঝে, এদেশের বিরুদ্ধে তাদের বিপক্ষে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগ এনে নতুন রণকৌশল নিল পাকিস্তান। গত ১৮ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়— ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে '(অপ) প্রচার চালানোর হাতিয়ার' (প্রোপাগান্ডা টুল) হিসেবে 'সন্ত্রাসবাদ'কে ব্যবহার করছে। ভারতের ওপর চাপ বাড়িয়ে পাকিস্তান আরও বলেছে, জম্মু-কাশ্মীরের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার একটা সমাধান যখন সবেমাত্র দৃশ্যমান হচ্ছিল তখনই ভারত নাকি সেখানকার পরিস্থিতিটা জটিল করে তুলছে। তা তো বটেই! কথায় বলে না 'দ্য বেস্ট ডিফেন্স ইজ টু টেক অফেন্স'... 'টু টেক অফেন্স, ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স'। নিজেদের অপকর্ম তো এরকম আক্রমণাত্মক হয়েই ঢাকা যায়। তাই না?

বন্দুকের মুখে

ক্রমেই জটিল হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষের পরিস্থিতিটা। গত ১৬ ডিসেম্বর উত্তর-পূর্বের জঙ্গি গোষ্ঠী ইউ এন এল এফ-এর সশস্ত্র শাখা মণিপুর পিপলস আর্মির সঙ্গে অসম রাইফেলসের দীর্ঘক্ষণ ধরে ভারী গুলি বিনিময় হয়েছে বলে সংবাদ-সংস্থা সূত্রের খবর। ব্রহ্মদেশের সীমানায় চান্দেল জেলায় তাদের এই লড়াই চলে। এখনও অবধি কোনও হতাহতের খবর নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের অকর্মণ্যতা ও পেশাদারী মানসিকতার অভাবে কাশ্মীরসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদ যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এই ঘটনা তারই ফলশ্রুতি বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

দুর্নীতির বলি

দুর্নীতিতে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়া কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের সমস্যা আগেই বাড়িয়েছিলেন প্রসার ভারতীর সি ই ও, বি এস লাল্লি। তাঁর নামে আর্থিক দুর্নীতির মারাত্মক অভিযোগ উঠেছিল। এবারে সরকারকে আরও প্যাঁচে ফেলে কেন্দ্রীয় তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের নির্দেশ মেনেই সাসপেন্ড হয়েছেন তিনি। রাজধানীতে কানাকানি চলছে, সরকারের প্রত্যক্ষ মদত না থাকলে একসাথে বিভিন্ন সরকারী দপ্তর বা সংস্থার প্রধানরাই শুধু এভাবে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন কিভাবে? এক্ষেত্রে কালমাডি থেকে আন্দিমুথু রাজার যোগ্য উত্তরসূরী বি এস লাল্লি ছাড়া আর কে-ই বা হতে পারেন? হয় পদত্যাগ, নয় সাসপেন্ড— এদের ভবিতব্যও মোটামুটি এক। তাই রাজধানীতে সেই প্রশ্নটা হাওয়ায় ভাসছে— দুর্নীতির রাঘববোয়ালকে আড়ালে রাখতেই এই চুনোপুঁটিদের দুর্নীতির বলি করা হচ্ছে না তো?

মোদীর বই-প্রকাশ

নরেন্দ্র মোদীকে এতকাল দুঁদে রাজনীতিক হিসেবেই চিনতো গুজরাট সহ সমগ্র দেশবাসী। কিন্তু গত ২১ ডিসেম্বর দেশবাসী মোদীর ভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত হলো। ওইদিন রাজধানী আমেদাবাদে 'কনভিনিয়েন্ট অ্যাকশান— গুজরাট'স রেসপনস টু চ্যালেঞ্জেস অব্ ক্লাইমেট চেঞ্জ' শীর্ষক একটি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম। বইটিতে ধরা দিয়েছেন— পুস্তকপ্রেমী, সাহিত্যপ্রেমী, পরিবেশ-সচেতন নরেন্দ্র মোদী। বইটির প্রকাশক ম্যাক-মিলান।

জয়ের পূর্ণতা

নিজের মুখ্যমন্ত্রিত্বের গদী বাঁচানোর লড়াই-তে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জয়লাভ করেছিলেন মাস-দু'য়েক পূর্বেই। সেই জয়-ই পূর্ণতা লাভ করলো গত ১৬ ডিসেম্বর। ওইদিন দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় চারজন বিজেপি এম এল এ-র পিটিশন বাতিল করে দেয় এবং সেইসঙ্গে গত ২৯ অক্টোবর কর্ণাটক বিধানসভার স্পীকারের তাঁদের দল-বিরোধী কাজের জন্য বিধানসভা থেকে বহিষ্কারের যে আদেশ বহাল রেখেছিল কর্ণাটক হাইকোর্ট, তাকেই সমর্থন জানায়। ওই চারজন বিধায়ক হলেন— গোপালকৃষ্ণ বেলুড়, শিবানাগৌদা নায়েক, শঙ্কর লিঙ্গ গৌদা এবং বেল্লুরি। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ইয়েদুরাপ্পা-কে স্বস্তির পাশাপাশি রাজ্য-সুশাসনের নিশ্চয়তাও দিল বলে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এই কি পরিবর্তন?

গত কয়েক মাস ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গে যাহা চলিতেছে তাহাকে আর যাহাই বলা হউক, কিছুতেই তাহাকে গণতান্ত্রিক রাজনীতি তো বটেই, রাজনীতিও বলা যায় না, বরং প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্রতা বলাই সঠিক হইবে বলিয়া ধারণা। কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত কিছু বুদ্ধি জীবী আছেন যাহারা নিজেরা হিংসার আগুন হইতে নিরাপদ দূরত্বে থাকেন অথচ পরিবর্তনে হিংসা অনিবার্য বলিয়া মার্ক্সীয় কেতাবী বুলি আওড়ান। ইহাদের বক্তব্য— 'একদল পরিবর্তন চাহিতেছে এবং আরেক দল তাহাতে বাধা দিতেছে বলিয়াই নাকি এই হিংসা ঘটিতেছে। যে কোনও পট-পরিবর্তনের সময়েই নাকি সংঘর্ষ অনিবার্য। পরিবর্তনের সময় কখনও কখনও নাকি সহিংস আন্দোলনের প্রয়োজন হয়। এইসকল বুদ্ধি জীবীগণ কলকাতায় বসিয়া আস্তিনের নীচে যে জঙ্গ লমহলের রাজনীতি করেন তাহা বেশ বোঝা যায়। এই পরিবর্তনকামী হিংসায় উস্কানিদাতাদের কেন গ্রেপ্তার করা যাইবে না?

এই সকল পণ্ডিতদের কাছে মানুষ যদি প্রশ্ন করে 'পরিবর্তন কাহাকে বলে'? তাহারা কি বলিতে পারেন যে কাহারও মাথায় লাঠি মারিয়া তাহার ঘর দখল করিবার নামই পরিবর্তন! শুধু কার্ল মার্ক্সের কয়েকটি পাতা পড়িয়া বুদ্ধি জীবী বনিয়া যাওয়া কিছু ব্যক্তির আদপেই ভারতীয় সংস্কৃতি তথা হিন্দু সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ বেদ-বেদান্তের সহিত কোনও সংস্পর্শই নাই। থাকিলে জানিতেন 'অসৎ হইতে সৎ পথে আগমন, অন্ধকার হইতে আলোর দিকে যাত্রা, শিক্ষা হইতে জ্ঞানে উত্তরণের' এবং রাজনীতি হইতে সংস্কৃতিতে পৌঁছানোটাই মৌলিক পরিবর্তন।

কমিউনিস্ট দুঃশাসনের নারী সম্ভ্রমহরণকারী শাসন হইতে তৃণমূলী কংগ্রেসীদের দুর্যোধনের প্রতিহিংসার যুদ্ধ কোন বিচারে পরিবর্তন? একবার কংগ্রেসীদের তাড়াইয়া কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় বসানোটা ছিল পরিবর্তন; এখন আবার কমিউনিস্টদের তাড়াইয়া তৃণমূলী কংগ্রেসীদের ক্ষমতায় বসানোটাও নাকি পরিবর্তন। উভয়ের মধ্যে গুণগত প্রভেদ কী? উভয়েই মুসলিম তোষণে একে অপরের প্রতিযোগী। উন্নয়ন বলিতে উভয়েই শুধু মুসলিম উন্নয়নই বোঝে।

যাহা হউক, আবার মূল প্রশ্নে ফিরিয়া আসি। প্রথমত, এই পরিবর্তন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ছাড়া আর কিছুই নহে। গুপ্ত যুগের হিন্দু সাম্রাজ্যের পতনের পর যেমন মোগল-পাঠান, তুর্কী ও ইংরেজরা একে অপরকে হারাইয়া ক্ষমতা দখল করিয়াছিল তাহা কী পরিবর্তন ছিল? তবে বিদেশী শাসকদের বিতাড়িত করিয়া স্বাধীন ভারত অর্থাৎ হিন্দুস্থান গঠন অবশ্যই পরিবর্তন। পরাধীনতা হইতে স্বাধীনতায় উত্তরণ। কংগ্রেস-তৃণমূল জোট সরকারের ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা আসলে এক হিন্দু-বিদ্বেষী জোটের জায়গায় আর এক হিন্দু-বিদ্বেষী জোটের ক্ষমতা দখল। হিন্দু বা হিন্দুত্ববাদীদের ইহাতে উল্লসিত হইবার কিছু নাই। রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলে হিন্দু-বিদ্বেষীদের তথাকথিত পরিবর্তনে কখনও গা-ভাসানো উচিৎ নহে।

বিহারে বি জে পি-জে ডি (ইউ) নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট হিংসা বিনাই যাদব-পাসোয়ানদের বাহুবলী দুঃশাসনের যে অবসান ঘটাইয়াছে তাহা কী পরিবর্তন নহে? বিহার আজ মৌলিক পরিবর্তনের পথে। প্রতিহিংসা নয়, সংযমী, ধীর স্থির, ধৈর্যশীল বিকাশের নীতিই একটি রাজ্যকে সর্ব-প্রকার উন্নয়নে উত্তরণের পথে লইয়া যাইতে পারে। হিংস্রতার পথে প্রতিহিংসা চরিতার্থতা কখনই কোনও পরিবর্তন আনতে পারিবে না।

ছাত্র মৃত্যুর পর এক তৃণমূলী নেতার বক্তব্য ঃ 'ওরাতো আমাদের দেড় হাজার ছাত্রকে খুন করিয়াছে, আমরা তো সবে একটা করিয়াছি।' অর্থাৎ আরও দেড় হাজার ছাত্র খুনই তাহাদের লক্ষ্য। মৌলিক পরিবর্তনের কোনও লক্ষ্য নাই। ছাত্রদের মৃত্যুতে তাহাদের তাপ-অনুতাপের কোনও লক্ষণই নাই। নেত্রী আঙুল তুলিয়া আস্ফালন করিতেছেন— আমরাই ক্ষমতায় আসিতেছি সকলে যেন মনে রাখে অর্থাৎ এখন হইতেই পুলিশ বিভাগকে বাগে আনার ইঙ্গিত। এই কংগ্রেসীদের তো আমরা চিনি। ইহাদের ক্ষমতা লাভ আসলে ৭০ দশকে প্রত্যাবর্তন। এক ভয়াবহ পরিণতির পুনরাবৃত্তি। বামেদের দুঃশাসন অবশ্যই যাওয়া উচিৎ;কিন্তু এই হিংস্র শক্তি যেন একক গরিষ্ঠতা না পায়। ঐক্যবদ্ধ হিন্দু ভোটই ইহার একমাত্র সমাধান। হিন্দু ভোট যেন কোনও মতেই কোনও হিন্দু বিদ্বেষী দল বা জোটের বাক্সে না যায়।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

গ্যেটে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ইমার্সন ও থেরো এই সকল কবিরা বিশেষ শক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যা কিছু বলেছেন সে সমস্ত ও তার থেকেও অনেক বেশি আমরা প্রাচ্যের ধর্মগ্রন্থগুলি হতে পাই। ভগবদ্গীতা ও উপনিষদগুলি এরূপ সর্ববিষয়ের জ্ঞানের আধার, যেন পূর্ণতায় এক একটি দেবতার সঙ্গে তুলনীয়।

—জি ডব্লিউ রাসেল (আইরিশ কবি)

তামিলনাড়ুতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হলে বাংলায় উদ্বাস্তুদের জন্য হবে না কেন?

অসিতবরণ ঠাকুর

৯ নভেম্বর, ২০১০-এর এক খবরে প্রকাশ ইউপিএ নেত্রী সোনিয়া গান্ধী বলেছেন "শ্রীলঙ্কায় আটকে পড়া তামিল নাগরিকদের ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।" এ ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠিও দিয়েছেন। তার আগে ৪ অক্টোবর ২০০৯-এর খবরে প্রকাশিত হয়েছিল ডি এম কে মুখ্যমন্ত্রী এম. করুণানিধির দাবীকে স্বীকার করে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম (উদ্বাস্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত) ঘোষণা করেছিলেন যে "কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে আসা তামিল উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে।" সে খবরকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালি উদ্বাস্তুদেরও (সারা ভারতে ২ কোটির বেশি) একই সঙ্গে নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসন দেওয়ার দাবী জানানো হয়েছিল 'অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্ট'-এর পক্ষ থেকে। বাঙালি উদ্বাস্তুদের কি করা হবে সে ব্যাপারে এখনও কিছু শোনা যাচ্ছে না বলে আমরা উদ্বিগ্ন। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে বাঙালি উদ্বাস্তু খেদাও আন্দোলন ও নির্যাতন অব্যাহত গতিতে চলছে।

'পরিবর্তনের' ঝোড়ো হাওয়ায় দিশেহারা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তার বামফ্রন্ট শেষলগ্নের মরিয়া চেষ্টায় মাঠে নেমেছেন। আশা, 'যদি হাওয়া ঘোরানো যায়' বা 'ঘুরে দাঁড়ানো যায়'। ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এর খবরে প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 'সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের' (ইউ সি আর সি) দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৪৮টি উদ্বাস্তু কলোনীর (রেলের জমিতে গড়ে ওঠা ১৯৭টি সহ) বাসিন্দাদের জমির পাট্টা দেওয়ার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী বিনয় বিশ্বাসও দাবীসনদ অর্পণের সময় উপস্থিত ছিলেন। পরে বিনয়বাবু জানিয়েছেন "রেলের জমি অর্পণের জন্য রেলমন্ত্রীকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে।" রেলমন্ত্রী অবশ্য পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন যে রেলের জমিতে বসবাসকারী উদ্বাস্তুসহ সমস্ত মানুষদেরই রেলের খরচায় ফ্ল্যাট বানিয়ে দেবেন। রাজ্য সরকারের এই বিলম্বিত পদক্ষেপ রেলমন্ত্রীর প্রচেষ্টাকে বানচাল করার প্রয়াস নয় তো? সময়ই তা বলবে। কিন্তু রাস্তাঘাটে বা অন্যত্র বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করা উদ্বাস্তুদের (মরিচঝাঁপি-উৎখাত উদ্বাস্তু সহ) নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিনা তা পরিষ্কার নয়। সরকারী জমিতে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের জমির পাট্টা না দিয়ে বনহুগলী ও ভদ্রকালী উদ্বাস্তু কলোনীর জমি প্রোমোটারদের দেওয়ার যে অপচেষ্টা চলছে তা বন্ধ হবে তো? এ নিয়ে অসন্তুষ্ট উদ্বাস্তুদের প্রতিবাদ এখনও অব্যাহত। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে বহু লেখালেখি, সংবাদ প্রচারও হয়েছে। রিফিউজি ফ্রন্টও সনদপত্র দিয়ে প্রতিবাদ করে প্রতিকার চেয়েছে।

পরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কৃষ্ণনগরের এক মিটিং-এ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার কথা বলেছেন। হিডকো অপকর্মে অভিযুক্ত গৌতম দেব বেসামাল হয়ে ভুল বকতে বকতে সখেদে বারে বারে উদ্বাস্তুদের নাম করেছেন আর পার্টিকে দুষছেন। অবশ্য বিমান বসু বা সিপিএম-এর অন্য কেউ অথবা শরিকদলের অন্য বাম নেতারা উদ্বাস্তু সম্পর্কে টু শব্দটি করছেন না। পাছে 'মরিচঝাঁপি' বা উদ্বাস্তুদের উপর সুদীর্ঘ কালের অবহেলা, নির্যাতনের ইতিহাস যদি ভুলবশত মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। শেষ সময়ে ভোলবদল বা উদ্বাস্তু দরদ কি কোনও কাজে আসবে ভোটে? সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে?

২০১১-র বিধানসভার নির্বাচন আর কয়েক মাসের মধ্যে হবে। ভোটের মুহূর্তে উদ্বাস্তু সম্পর্কে এই বোধোদয় বা ভোলবদল কি ১৯৭৮-৭৯ সালের মরিচঝাঁপির গণহত্যা

করুণানিধি যদি তামিলদের জন্য করতে পারেন তাহলে আপনারাই বা বাঙালি হয়ে অসহায় বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসন কেন আদায় করতে পারবেন না?

বা সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর ধরে তাদের ধারবাহিক অবহেলা ও প্রতারণার মর্মবেদনা ভুলাতে পারবে? ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সংকীর্ণ রাজনৈতিক প্রয়োজনে বুদ্ধবাবুর নির্দেশে উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশ ও রাজনৈতিক দলের অন্যায় ও বেআইনি হস্তক্ষেপ, হয়রানি, অত্যাচার, নির্যাতন, গ্রেপ্তার ও জেলের ভীতি ও আতঙ্ক তাদের আজও তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার জানা বাবলু ভট্টাচার্য, সঞ্জীব সরকার, কল্লোল বিশ্বাস, রবিরঞ্জন শাঁখারীর মতো উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানীয় প্রধান শিক্ষকদের এবং অজানা বহু চাকুরিজীবিদের অপমানিত, পর্যুদস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে বিচারের আশায় ছোটছুটি করতে হচ্ছে দুয়ারে দুয়ারে। এ যেন এক 'হবু রাজার গবু মন্ত্রী'র দেশ। ন্যায়-অন্যায়, আইন-কানুন, সরকার-প্রশাসন থেকেও নেই।

দেখে নেওয়া যাক ২০০৬ সালের ১২ এপ্রিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভোট রাজনীতির সংকীর্ণ স্বার্থে ঠিক কি বলেছিলেন 'মিট দি প্রেস' অনুষ্ঠানে— '১৯৭১ সালের পর হিন্দু বা মুসলিম যারাই এদেশে এসেছে, তারাই বিদেশী। এদেশে থাকার কোন অধিকার নেই তাদের। ভোট দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।" (সূত্র ঃ বর্তমান, ১৩ এপ্রিল ২০০৬)। এই খবর প্রকাশিত হবার পর উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে পুলিশ ব্যাপক আকারে ধরপাকড় শুরু করে কোনও বাছবিচার না করে। এই অভিযানে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সিপিএম ক্যাডার বাহিনী যোগদান করে। পরিণতিতে বামবিরোধী উদ্বাস্তুরা ভয়ে- ভীতিতে বামেদেরই ভোট দিতে বাধ্য হওয়ায় ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট ২৩৫ টি বিধানসভা আসনে জয়ী হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে। সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। হয়তো বা আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালেও চলবে।

সিপিএম তথা বামফ্রন্টের উদ্বাস্তু সম্পর্কে মনোভাব কি? তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশ্লেষণ প্রয়োজন। দেশভাগের বলি বা স্বাধীনতার বলি পূর্ববাংলার ছিন্নমূল বাঙালি উদ্বাস্তুদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার করে সিপিএম-এর বাম শাসনের প্রতিষ্ঠা, তা সবারই জানা। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় সিপিএম-এর বামফ্রন্টের নামে ক্ষমতা দখল মূলতঃ তাদেরই সক্রিয় সমর্থনে। কিন্তু ক্ষমতায় বসেই একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার লক্ষ্যে উদ্বাস্তুদের প্রতারিত ও নিজ-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ১৯৭৮-৭৯ সালে বিনা প্ররোচনায়, 'মরিচঝাঁপি'র প্রায় ৩০ হাজার দণ্ডকারণ্য ফেরৎ উদ্বাস্তুদের নিঃস্ব ও যাযাবর করেছিল। জ্যোতি বসু তার জীবদ্দশায় কোনও দুঃখ বা মর্মবেদনাও প্রকাশ করেননি। বুদ্ধবাবু বা তার দল বা শরিকদল কেউ আজও কোনও উচ্চবাচ্যও করছেন না। এই বাঙালি চেঙ্গিজ খান বা তার সাকরেদদের কোন ক্ষমা নেই। ইতিহাস কখনো ক্ষমা করে না। তবে বলা দরকার হিংসাশ্রয়ী একনায়কতন্ত্রের পুজারী 'কমিউনিস্টদের ধর্ম'ই তাই। এর অন্যথা হবে কি করে? রাশিয়ার লেনিন বা স্ট্যালিন কর্তৃক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় লক্ষ লক্ষ স্বধর্মীয় কমরেডদের হত্যার ইতিহাস তাদের শিক্ষা দিয়েছে। 'সিপিএম' লেনিন-স্ট্যালিনের উপযুক্ত উত্তরসূরী! মরিচঝাঁপি গণহত্যা দিয়ে বামফ্রন্টের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শুরু, তা আজও অব্যাহত।

ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত ও ত্রস্ত সিপিএম ও তার শরিকরা উদভ্রান্তের মতো আচরণ করছেন। উদ্বাস্তু সম্পর্কে হালের 'মতপরিবর্তন' (নাকি কৌশল পরিবর্তন?) যদি মৃতপ্রায় উদ্বাস্তুদের মনে সঞ্জীবনী সুধার কাজ করে তা মন্দ কি? আর কেউ বা কোন দল তো অদ্যাবধি উদ্বাস্তুদের জন্য কুম্ভিরাশ্রুও ফেলছেন না! 'মরণের সময় হরিনামে'ও কিছু কাজ হয়। বুদ্ধবাবুরা উদ্বাস্তুদের পাট্টা দিচ্ছেন ভাল। তাড়াতাড়ি দিন। পুনর্বাসনের জন্য বাড়ী ও রুজি-রোজগার দিন। এই সঙ্গে উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে ঝুলে থাকা বিদেশী আইনের সমস্ত অবৈধ মামলা নিঃশর্তে তোলার নির্দেশও দিন। ভবিষ্যতে উদ্বাস্তুদের আর পুলিশি-ক্যাডার বাহিনীর হয়রানির শিকার হতে না হয় তারও নির্দেশনামা জারী করুন। ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পরে আসা সমস্ত বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের (রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বাস্তু সংজ্ঞা ও বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুরাই উদ্বাস্তু অন্যরা নন) নাগরিকত্ব সহ পূর্ণ পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে দরবার করুন। এখনই

(এরপর ৪ পাতায়)

সঙ্কটে পড়লেই সঙ্ঘের দিকে আঙুল তোলে কংগ্রেস ঃ ভাইয়াজী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি কংগ্রেস অধিবেশনে গত ১৯ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সম্পর্কে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দিগ্বিজয় সিংহের অভিযোগকে বিশ্বাসযোগ্যতাহীন, ভিত্তিহীন, মিথ্যা এবং সত্যের অপলাপ বলে এক বিবৃতিতে সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী মন্তব্য করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, "কংগ্রেস চারদিক থেকে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে সঙ্কটগ্রস্ত। এমতাবস্থায় জনমানসের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে।

সঙ্ঘের সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগ কংগ্রেস বহু আগে থেকেই করে আসছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সঙ্ঘ প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে সঙ্ঘের প্রতি সমাজের সমর্থন প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে।

সংখ্যালঘু ভোটের লালসায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে অভ্যস্ত কংগ্রেস দল অতীতেও যখনই সঙ্কটে পড়েছে, তখনই সঙ্ঘের ওপর তীব্র অভিযোগের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশভাগের বিভীষিকা থেকে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার জন্য অথবা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে নির্বাচনে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর জয়লাভ নিষিদ্ধ হওয়ার পর ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য কংগ্রেস এই কাজই করেছে।

সঙ্ঘ প্রথম থেকেই সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে আসছে যে, সঙ্ঘ কোনওরকম হিংসাত্মক কার্যকলাপে বিশ্বাস বা সমর্থন করে না। এরকম কোনও ঘটনা ঘটলে নিরপেক্ষ তদন্ত, আইনী ব্যবস্থা নেওয়া এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক। যেক্ষেত্রে কেবলমাত্র তদন্ত চলছে— আইনী প্রক্রিয়া এখনও শুরুই হয়নি, সেক্ষেত্রে এধরনের ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলা বিচার-বিভাগীয় কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপের সামিল। সন্ত্রাসবাদকে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরুর সন্ত্রাসবাদ বলে অভিহিত করা অনুচিত এবং তা সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার সদিচ্ছাকেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, অদূর ভবিষ্যতে দেশপ্রেমিক শক্তিকে কী কী ভাবে ফাঁসানো হবে তার সঙ্কেতও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিশ্বাস, দেশের সর্বসাধারণ মানুষ এধরনের চালাকির ফাঁদে পা দেবেন না এবং সঙ্ঘের কাজ দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য নিরন্তর চলতে থাকবে।"

প্রয়াত কালিদাস বসুর স্মরণসভা

কালিদা বঙ্গ-প্রান্তের সঙ্ঘকার্যের পাইওনীয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কালিদাস বসু আমাদের প্রদেশে সঙ্ঘকার্যের পাইওনীয়র। যাঁরা পাইওনীয়র বা অগ্রদূত হন কোনও বাধাই তাঁদের দমিয়ে রাখতে পারে না। সঙ্ঘের কাজ নিয়মসর্বস্ব নয়, আত্মীয়তার বন্ধনই সঙ্ঘের কাজের মূল চালিকা শক্তি। এই আত্মীয়তার বন্ধনেই কালিদা আমাদের সকলকে বেঁধে রেখেছিলেন। সঙ্ঘের কাজ তাঁর জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। গত ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতায় কেশব ভবনে প্রয়াত কালিদাস বসুর স্মরণসভায় স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এই কথাগুলি বলেন সঙ্ঘের প্রাক্তন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী।

প্রয়াত কালিদার মৃত্যুকে 'চলতে চলতে চলে যাওয়া অর্থাৎ কর্মবীরের মতো বলে বর্ণনা করেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মরণসভার সূচনায় প্রয়াত কালিদার প্রতিকৃতিকে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান

স্মৃতিচারণে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পাশে (বাঁ দিক থেকে) অতুল বিশ্বাস, শিবাজী প্রতিম বসু, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী ও অনিন্দিতা বসু। ছবি ঃ শিবু ঘোষ

শ্রীচক্রবর্তী, শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল বিশ্বাস এবং প্রয়াত বসুর পুত্র শিবাজীপ্রতিম বসু ও পুত্রবধূ অনিন্দিতা বসু। সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের সহপ্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী প্রয়াত বসুর জীবনপঞ্জী সংক্ষেপে সকলকে জানান।

পিতার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে শ্রীবসু বলেন, তিনি একজন আদর্শ মানুষ— সর্বজনপ্রিয়। তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন একটা 'প্রতাপ'-এর ভাব ছিল যা মানুষের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আকর্ষণ (কম্যান্ড) করত। তিনি কথা দিয়ে কথা রাখতেন এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তা পালন করে গেছেন।

অন্যান্যদের মধ্যে স্মৃতিচারণ করেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ডঃ তিলক রঞ্জন বেরা, ভ্রাতৃপ্রতিম প্রবীণ স্বয়ংসেবক শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ প্রমুখ।

এই অনুষ্ঠানে সময়োচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ ভট্টাচার্য ও দেবাশীষ লাহিড়ী। প্রয়াত আত্মার সদ্‌গতি প্রার্থনা করে দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সবশেষে উপস্থিত সকলে প্রয়াত বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জয়ন্ত পাল।

অঘোষিত খতমের রাজনীতি চলছে

(১ পাতার পর)

রাজনীতি করেছিল। নিহতদের রক্তে কলঙ্কিত হয়েছিল এই তিন দলের হিংসার রাজনীতি। চল্লিশ বছর পর সেই অন্ধকার সময় ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র চলছে। বেওয়ারিশ লাশ যেমন শকুনে ছিঁড়ে খায়, ক্ষমতা দখলে তেমনি সিপিএম তৃণমূল দল পশ্চিমবঙ্গকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাচ্ছে। লাশ ফেলার রাজনীতিতে কে কত দক্ষ তার প্রতিযোগিতা চলছে।

সত্তরের দশকে নকশালরা ছাত্র রাজনীতিতে হিংসার বীজ বপন করেছিল। আর সেই বীজে জলসিঞ্চন করেছিল কংগ্রেসের ভৈরব বাহিনী। যে বাহিনীর পোশাকি নাম ছিল ছাত্র পরিষদ। প্রধান নেতা ছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি-সুব্রত মুখোপাধ্যায়রা। তখন তাঁরা বলতেন, 'আমাদের ছেলেরা খুন হলে খুনীদের কি রসগোল্লা সন্দেশ খাওয়াবো'। নকশাল-কংগ্রেস উভয়েই প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র রাজনীতিতে অবাধ হিংসায় মদত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিক্ষার পরিবেশটিকেই খতম করে দিয়েছিল। রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অরাজকতা চল্লিশ বছর পরেও একইভাবে অন্ধকারে ডুবে আছে। আজও সেই একইভাবে মেধাবী ছাত্ররা মায়ের কোল শূন্য করে চলে যাচ্ছে। ছাত্র রাজনীতির বলি হচ্ছে। মৃতদেহে মালা দিয়ে কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন দিচ্ছেন সিপিএম তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা। প্রতিযোগিতা চলছে কোন দল আগে মৃতদেহ দখল করতে পারে। কে প্রথম মিছিল বার করতে পারে। মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা সিপিএম এবং তৃণমূলের যে মুখ এখন পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখছেন নিঃসন্দেহে তা' ভীতিজনক। সি পি এমের নগ্ন সন্ত্রাস রাজ্যবাসীর অচেনা নয়। যা' অজানা অচেনা ছিল তা তৃণমূলের পাল্টা সন্ত্রাস। সিপিএমের যদি সুশান্ত ঘোষ থাকেন তবে তৃণমূলের শুভেন্দু অধিকারী আছেন। দু'জনের রাজনীতি ভিন্ন কিন্তু রাজনীতির হাতিয়ার অভিন্ন। সেই হাতিয়ার হিংসা। এক দলীয় স্বৈরাচার। সেটা যে কতটা ভয়াবহ তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষ। সিপিএমকে হঠিয়ে তৃণমূল মহাকরণ দখল করলেও রাজ্যের আমজনতার অবস্থা যে একই থাকবে তা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সিপিএম-তৃণমূল একই মুদ্রার দুই পিঠ। এই দুই দলই রক্তের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আর সেই রক্ত দিচ্ছে রাজ্যের নবপ্রজন্মের ছেলেমেয়েরা।

বাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য হবে না কেন?

(৩ পাতার পর)

উপযুক্ত সময়। পরে আর কোনওদিন সুযোগ পাবেন না। জ্যোতিবাবু তো ক্ষমতায় থেকেও করলেন না। আপনি শেষ লগ্নে এটা করতে পারলে ইতিহাস স্মরণে রাখবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এটা সুযোগ। তিনি একটু এগিয়েছেন রেলের পাশের উদ্বাস্তুদের জন্য। আর একটু এগোন। আপনারা দু'জনেই একসঙ্গে কেন্দ্রে দরবার করুন। করুণানিধি যদি তামিলদের জন্য করতে পারেন তাহলে আপনারাও বা বাঙালি হয়ে অসহায় বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসন কেন আদায় করতে পারবেন না?

এনডিএ-র আমলে ২০০৪-এর নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিধি পাশ হলো শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের জন্য। তখনও বাঙালি উদ্বাস্তুর কথা বাংলার সাংসদরা বা কোনও উদ্বাস্তু অধ্যুষিত সরকার তুললেন না। এই আত্মঘাতী মনোভাব কেন তা এক রহস্য। সারা ভারতে পথেঘাটে পড়ে থাকা অসহায় বে-নাগরিক যাযাবররা মানবেতর জীবনে অভ্যস্ত বাঙালি উদ্বাস্তুদের মর্মবেদনা অনুভব করুন এবং মানবতার সংকটকারি 'জাতীয় জ্বলন্ত সমস্যা'র সমাধান করুন।

২০০৩ সালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের 'স্থায়ী সিলেক্ট কমিটি'র চেয়ারম্যান হিসাবে প্রণব মুখার্জী ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের পরে আসা বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবীর বিষয় ২০০৩-এর নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিলে অন্তর্ভুক্তি বিবেচনা করার আশ্বাস আমাদের দিয়েও পূরণ করতে পারেননি। তার প্রতি আবেদন, তার আগের আশ্বাস পূরণ করুন। ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩-এ রাজ্যসভায় বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের জন্য নাগরিকত্বের দাবীদার তৎকালীন কংগ্রেস বিরোধী দলনেতা ও ১০ মার্চ ২০০৫-এ লোকসভায় প্রথম ইউপিএ-র প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং এর সেই দাবীর স্বীকৃতিকে সম্মান জানিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নিজের দাবী পূরণে এগিয়ে আসা উচিত।

পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা ন্যায় বিচার পেয়েছে ও এখনো পাচ্ছে। বাঙালি উদ্বাস্তুরা কি দোষ করলো? তামিল উদ্বাস্তুদের তুলনায় স্বাধীনতার বলি বাঙালি উদ্বাস্তুদের অগ্রাধিকার প্রাপ্য হলেও অন্তত তারা এখন সমপর্যায়ভুক্ত। তারা উভয়েই সমভাবে, সমদৃষ্টিতে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। ন্যায় বিচার, ভারতের সংবিধান ও রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সনদ অন্তত তাই বলে।

বিদেশী অর্থ প্রাপ্তির শীর্ষে খৃস্টানরা

(১ পাতার পর)

সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ুর চেন্নাই-এর ওয়ার্ল্ড ভিশন অব ইন্ডিয়া (২১১.৬২ কোটি টাকা)। এরপরই রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরের রুরাল ডেভলপমেন্ট ট্রাস্ট (১২৪.৭৯ কোটি টাকা)। কেরলের বিলিভার্স চার্চ ইন্ডিয়া বিদেশী সাহায্য হিসাবে পেয়েছে ১০১.৬৮ কোটি টাকা।

দাতা দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা রয়েছে সর্বোচ্চ স্থানে। ভারতে পাঠানো তাদের সাহায্যের পরিমাণ ২ হাজার ৯২৮.৩০ কোটি টাকা। এরপর বৃটেন (১ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা), জার্মানী (৯৭১.০২ কোটি টাকা)। ইতালি পাঠিয়েছে ৫১৪.৮৯ কোটি টাকা।

ছোটোদের মধ্যে বই-সংস্কৃতি

(১ পাতার পর)

ছোটোদের ব্যবহারের সিঁড়ির ধাপ যেন ছোট হয়। ইতিহাসের সেই নির্দেশ সানন্দে মেনেছিলেন। আয়োজন ঠিক ছিল। ছোটোরাও আসা শুরু করে। কিন্তু অনিচ্ছুক কর্মীরা চাইলেন না ছোটোরা আসুক। তাদের চরম অসহযোগিতায় ছোটোদের বিভাগ বন্ধ হয়ে গেলো। রাজ্যের প্রধান গ্রন্থাগারের ছোটোদের বিভাগের হাল যখন এরকম, তখন অন্য গ্রন্থগারে উন্নতমানের পরিষেবা আশা করা অন্যায়। পরিষেবা নেইও। অধিকাংশ স্কুলে ছোটোদের লাইব্রেরি নেই। থাকলেও ছোটোদের বই দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না। আসলে গরজ নেই কারও। ক'টা বাড়িতে নিয়মিত বই কেনা হয় ছোটোদের জন্য? ছেলেমেয়েদের বই উপহার দিয়ে আনন্দ পান ক'জন অভিভাবক? তবে তখন অভিভাবকও দেখা যায়, ছোটোদের জন্যে আলমারি কিনে বই সাজিয়ে দেন। বই কিনতে পড়তে উৎসাহ দেন। ছোটোদের পড়ার মন আছে। তারা নানারকম বই চায়। কিন্তু বইজগতের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন বড়োরা। তারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁরা এত বেশি মুনাফা আর স্বার্থবুদ্ধির অঙ্ক কষে চলেছেন যাতে ছোটোদের মধ্যে বই-সংস্কৃতি গড়ে ওঠার কোনওরকম পরিবেশ পাচ্ছে না। এটা খুব খারাপ অবস্থা অনেকেই বলছেন। আমরাও বলি।

সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের নতুন কৌশল

(১ পাতার পর)

সঙ্গে আর এস এসের কোনও সম্পর্ক নেই। সঙ্ঘ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করার জন্যই উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে এসব কল্পিত-কাহিনী প্রচার করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, সঙ্ঘ কোনওরকম হিংসায় বিশ্বাস করে না। সঙ্ঘ একশো শতাংশ জাতীয়তাবাদী এবং দেশের সংবিধান ও আইন মেনে চলা সংগঠন। এটাই সঙ্ঘের পরম্পরা। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে হার্মাদদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠে না। বরং মাওবাদীদের হাতেই অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশাতে অনেক স্বয়ংসেবক নিহত হয়েছেন। সঙ্ঘে এক-আধদিন নতুন অনেকেই আসেন, পরে সম্পর্ক রাখেন না। তাদেরকে স্বয়ংসেবক হিসাবে ধরা হয় না। সঙ্ঘের সংবিধান অনুসারে যিনি নিয়মিত সঙ্ঘের শাখায় আসেন এবং সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করেন তারাই স্বয়ংসেবক— অন্যেরা নন।' উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের বামফ্রন্ট কর্মীরা গত ১৯৮৪ সাল থেকে এরাজ্যেও হত্যা করে আসছে। দক্ষিণদিনাজপুর জেলার হিলি থানার মুরারিপুরে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক প্রশান্ত মণ্ডলকে বামফ্রন্ট ক্যাডারেরা হত্যা করে (হাসপাতালে মারা যান)। দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে ওই বছরই মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁটাবাড়ি গ্রামে শিক্ষক ও স্বয়ংসেবক জগদীশ সাহাকেও হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সোনাখালিতে চারজন স্বয়ংসেবককে ২০০১-এর ১০ ফেব্রুয়ারি বামফ্রন্ট ক্যাডাররা (পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে) কানপট্টীতে বন্দুক ঠেকিয়ে হত্যা করে। এখনও আসামী ধরা পড়েনি। হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার জগন্নাথপুরের স্বয়ংসেবক দুইভাই দয়াল ও হারাধন সিংহরায়কে সিপিএম ক্যাডাররা কুপিয়ে হত্যা করে তাদের রক্তে তাদেরই মাকে মাখিয়ে দেয় ২০০২ সালে। শুধুমাত্র কেরল প্রদেশেই শতাধিক স্বয়ংসেবক সিপিএম ক্যাডারদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। এরপরও সিপিএমের হার্মাদবাহিনীর সঙ্গে মিত্রতা সম্ভব?

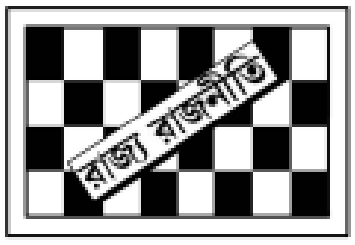

মাথাগরমওয়ালারা পার্টি থেকে বেরিয়ে যাক : বুদ্ধদেব

নিশাকর সোম

আগের সপ্তাহে লেখা হয়েছিল যে, সিপিএম-এর শুদ্ধি করণের কথা কেবলমাত্র ধাপ্পা। জনগণের সাম্‌নে দেখানো— আমরা সৎ হচ্ছি— 'তুলসী তলায় দিয়ে বাতি সবাই হয় সতী'। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে এক বহিষ্কৃত সিপিএম কর্মী বিমল রায়কে পার্টিতে ফেরত আনা হলো। তাঁকে তোলাবাজিসহ নানান অভিযোগে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। এখন তাঁকে পার্টিতে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, বিমল রায় ছাড়া উত্তরবঙ্গে ''বিরোধী শক্তির সঙ্গে'' মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ বিমল রায় একজন ম্যাসলম্যান। ম্যাসলম্যান ছাড়া নির্বাচন উৎরানোর কথা সিপিএম ভাবতে পারছে না। মার-কা বদলা মার-এর পরম্পরা চলেছে— চলবে।

সিপিএম পরাজয় নিশ্চিত জেনেই এই পথকে আঁকড়ে ধরছে। তাই পাড়ায় পাড়ায় ম্যাসলম্যানদের আবার নানা প্রলোভনে আর্কষিত করার চেষ্টা চলছে। সিপিএম তো বহু পুরাতন কর্মীদের বহিষ্কার করেছে। তাঁদের কাউকে কিন্তু ফিরিয়ে আনার কথা বলে না। কারণ তাঁরা রাজনৈতিকভাবে চলার চেষ্টা করবে— পেশীবলের মাধ্যমে নয়।

সিপিএম-নেতৃত্ব এখন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, রাজ্য-পাটের ক্ষমতায় আর ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা তাদের নেই। তাই বেপরোয়া হয়ে বিনয় কোঙার, শ্যামল চক্রবর্তী, সুশান্ত ঘোষ, রেজ্জাক মোল্লা তৃণমূল নেত্রী-নেতাদের কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করছেন— শালীনতার মাত্রা থাকছে না। দেহের সমস্ত রক্ত মুখে সঞ্চারিত হলে তাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে না। এর ফলে মধ্যবিত্তের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। ভোটের ফলাফলে টের পাবে সিপিএম।

সিপিএম মুখে ধর্মের বিরুদ্ধে ঢেকুর তুললেও দুর্গাপূজায় সাহিত্য বিক্রয় এবং পূজা সংখ্যা প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা ফ্লপ হয়ে গেছে। শারদীয়া "গণশক্তি"-র বিক্রয় অত্যন্ত কম। পার্টি-সদস্যদের কিনতে বাধ্য করা হয়েছে। পার্টি সদস্যগণ এই সংখ্যা কি পড়ে দেখেছেন? পার্টির জেলা-কমিটির সদস্যগণ কি পড়েছেন? না, সব জেলার জেলা-কমিটির সদস্যগণ পড়েননি।

এসবের মধ্যে সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা রাজ্যের মন্ত্রী গৌতম দেব রাজনৈতিক মহলে হুল্লোড় তুলেছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে উপহাস, ব্যঙ্গ, খোঁচা দেওয়া আছে। ফলে গৌতম দেব-কে পার্টির নিচের তলার কর্মীরা সভায় চাইছেন। তিনি কোনও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করছেন না। কিন্তু বিনয়-শ্যামল-সুশান্ত-দীপক সরকার খিস্তি-খেউড়ের বন্যা ছোটাচ্ছেন!

এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮ নভেম্বর ব্যারাকপুর আনন্দপুরী ময়দানে এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "সিপিএম-এ যাদের মাথা বেশি গরম তারা ওই মাথা নিয়ে বাইরে চলে যাক। পার্টিতে থাকতে হবে না।"

অবশ্যই বুদ্ধ বাবুর এই বক্তব্যকে বিনয়-দীপক-সুশান্ত-শ্যামল মোটেই গুরুত্ব দেবেন না। কারণ হলো, রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে বুদ্ধ বাবু একা। পার্টিসংগঠন দেখছেন মদন ঘোষ। তিনি ধীরে ধীরে রাজ্য-পার্টির সম্পাদক পদের দিকে এগোচ্ছেন। পুলিশ দেখছেন সূর্যকান্ত মিশ্র। তৃণমূলকে মোকাবিলা করছেন দীপক-সুশান্ত। বিনয় কোঙার মাঝেমধ্যেই কুৎসিত কথা বলছেন। পার্টির রাজনৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রীদীপ ভট্টাচার্যকে। বিমান বসু, বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য, নিরুপম সেন পার্টিতে কি ক্রমশ ব্রাত্য হবেন?

অন্যদিকে তৃণমূলনেত্রী সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেছেন,— "১১ তারিখের পর সিপিএম-এর খেলা শেষ। এরপর আমরা খেলা দেখাবো।" অর্থাৎ সিপিএমের পাল্টা চাল দেবেন মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল। আবার দু' পক্ষের 'যুদ্ধ'। মারা পড়বেন সাধারণ মানুষ। এদিকে মাওবাদী তথা অন্য জঙ্গিরা সারাভারতে এক সন্ত্রাস-বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। কার্যত কেন্দ্রীয় সরকার এক স্থবিরের অবস্থায় রয়েছে।

এরাজ্যে বিভিন্নপার্টির নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য ছয় হাজার পুলিশ নিয়োজিত হয়েছে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু পুলিশের সংখ্যা যে কোনও রাজ্য থেকে কম। ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থাটা কেমন? এরাজ্যে ডাকাতি, খুন-খারাপি বেড়েই চলেছে। মাওবাদীদের ডেরায় তল্লাশির ফলে অতিআধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং যোগাযোগের সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। কোনও অস্ত্রে নাকি রাশিয়া এবং আমেরিকার ছাপ আছে?

সিপিএম এখন তাদের ৩৫ বছরের কোনও ইতিবাচক কাজকে প্রচার করতে ব্যর্থ। ফলে গালিগালাজই সার। এর মধ্যে গৌতম দেব খুব কৌশলে রাজারহাটের তাঁর কাজকে সামনে এনে ফেলছে। এর ফলে হিডকোর সামনে তৃণমূলের জমায়েতে যথেষ্ট জনসমাবেশ হয়নি। তাই তৃণমূল নেতারা বলছেন, আগামী মন্ত্রিসভা গঠন করে সিবিআই তদন্ত করাবেন এবং অনিচ্ছুকদের জমি ফেরত দেবেন। জমি ফেরত দেওয়া কি করে সম্ভব হবে। কারণ জমিতে তো প্রকল্প গড়ে উঠেছে? এই সমাবেশে তৃণমূলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সৌগত রায় সি পি এম-নেতাদের 'বুনো শুয়োর' বলে গালাগালি করেছেন।

ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সাধারণ-সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস মহিলা সমাবেশে সিপিএম পার্টিকে 'বার ভুঁইয়াদের পার্টি' বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন, 'বামফ্রন্ট-এ সব পার্টির সমান অধিকার— এখানে বড়-মেজো সেজো কেউ নেই।" বামফ্রন্টের সব শরিকই বেশি সিট দাবি করছে। এদিকে বামফ্রন্টের মন্ত্রী কিরণময় নন্দ এক অস্বাভাবিক অবস্থায় এসেছেন। তিনি মুলায়ম সিং যাদবের পার্টির সাধারণ সম্পাদক, আবার তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চলেছেন। এই কিরণময়বাবু বলেছিলেন, "বামফ্রন্টের মৃত্যু হয়েছে, ডেথ-সার্টিফিকেট জনগণ দেবেন।"

এদিক থেকে মমতা ব্যানার্জি খুব অনুকূল অবস্থায় আছেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের এখন দিশাহারা অবস্থা। তাই এরাজ্যে কংগ্রেসকে মমতার শর্তেই জোট-এ থাকতে হবে।

সিপিএম-নেতৃত্ব এখন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, রাজ্য-পাটের ক্ষমতায় আর ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা তাদের নেই। তাই বেপরোয়া হয়ে বিনয় কোঙার, শ্যামল চক্রবর্তী, সুশান্ত ঘোষ, রেজ্জাক মোল্লা তৃণমূল নেত্রী-নেতাদের কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করছেন— শালীনতার মাত্রা থাকছে না।

শেকড়ের টান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বহু বছর আগের কথা। জন্ম মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে একটি হত-দরিদ্র মুসলমান পরিবারে। স্বাভাবিক নিয়তি যা হয় এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হলো না মুসলমান ছেলেটির ভাগ্যে। দিনের বেলায় মুটে-মজুরের কাজ আর দিনের শেষে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর দু'দণ্ড জিরোবার সুযোগ না নিয়েই স্কুলে যাতায়াত। এখানেই বোধহয় একটু 'অন্যরকম' সেই ছেলেটি। তাই পেটে বিদ্যের কানাকড়ি পড়তেই সে অনুভব করল তার 'শেকড়ের টান'। সেই শেকড় নিঃসন্দেহে প্রোথিত ভারতবর্ষে। সেই শেকড়ের অনুভব ভারতের সমাজ-জীবনে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে, এমনকী যে কোনও তথাকথিত নিম্নমানের কাজেও অনুভূত হতে বাধ্য। শেকড়ের নাম সংস্কৃত সাহিত্য। এই সংস্কৃত ভাষা তথা সাহিত্যকেই আপন করে নিল সেই মুসলমান ছেলেটি। তার নাম গুলাম দস্তাগির বিরাজদার। এই রকমই আরেকটি মুসলিম ছেলের নাম মুফতি মহম্মদ সরওয়ার ফারুকি। তিনি এখন লক্ষ্ণৌ-এর একটি মাদ্রাসা-র উলেমা। তবে

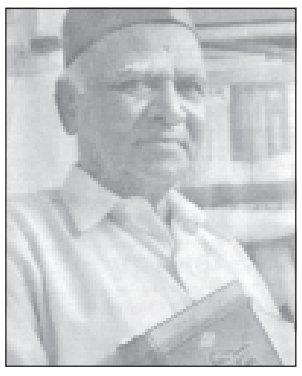

গুলাম দস্তাগির বিরাজদার ও মুফতি মহম্মদ সরওয়ার ফারুকি।

কোরান-হাদিসের উদ্ধৃতি আওড়ানোর তুলনায় সংস্কৃত শ্লোকেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ্য। এখানেও সেই শেকড়ের টান।

তবে গুলামের ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত্র। সংস্কৃতে তিনি শিখেছিলেন যে মনুষ্যমাত্রই অমৃতস্য পুত্র। সুতরাং জন-মজুরীর কাজ করেও যে মান ও হুঁশ সমৃদ্ধ মনুষ্য প্রজাতির মধ্যে পরিগণিত হওয়া যায় এই প্রতীতিটুকু তাঁর মধ্যে ছিল। সুতরাং লেখাপড়া শিখেছেন। আর তা শেখার দরুণ তাঁর উর্ণীশে এখন অনেক স্বর্ণ-পালকের সমাহার। যেমন তিনি বারাণসী কেন্দ্রিক বিশ্ব সংস্কৃত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক, মহারাষ্ট্র সরকারের সংস্কৃত স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য। প্রসঙ্গত, এই স্ট্যান্ডিং কমিটিই রাজ্যজুড়ে সংস্কৃত শিক্ষার দেখভাল করে। সেই সাথে ওরলি-তে তাঁর বাড়ির কাছেই শতবর্ষ পুরোনো সুফি সন্ত সৈয়দ আহমেদ বাদি দরগার প্রধান।

তবে কম পন্ডিত নন ফারুকি-ও। সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সংস্কৃততেই পেয়েছেন বেদান্তের শিক্ষা— একম ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি। উপলব্ধি করেছেন ইসলাম হোক বা আর কিছু উপাসনা-পদ্ধতি সবারই মূলে বেদান্তের শিক্ষা। হতে পারে, গুলাম কিংবা মুফতি— দু'জনের উপাসনা পদ্ধতি-ই মুসলমানী পন্থা। কিন্তু শেকড়ের টান এঁদেরকে সংস্কৃত ভাষা নিয়ে ভাবতে শিখিয়েছে। বেদান্তের আলোকে আলোকিত করেছে এঁদের অন্তরের অন্তর্লোক। ভারত-মাতা সহস্র দুঃখের মাঝেও এঁদের দেখে হয়তো বা গভীর প্রশান্তির শ্বাসটুকু নিতে পেরেছেন।

অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধা করে দিতেই অসমে নতুন করে নাগরিক পঞ্জীকরণ

বাসুদেব পাল।। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সংখ্যালঘু তোষণের পথেই চলতে চায় কংগ্রেসের তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন অসম রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিন যাবৎ রাজ্যের নাগরিকদের জন্য জাতীয় নাগরিক পঞ্জীয়ন সূচী তৈরির পাইলট প্রজেক্ট ঝুলে রয়েছে নানা কারণে। এর মধ্যে প্রমুখ কারণ ছিল— বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়া। সেজন্য নাগরিক সূচীতে নাম অন্তর্ভুক্ত করার অন্যতম শর্তই ছিল— ১৯৫১ সালের নাগরিক সূচীতে পূর্বপুরুষদের নাম থাকতে হবে। যদি কোনও কারণে ১৯৫১ সালের সূচীতে নাম না থাকে তাহলে অবশ্যই ১৯৭১ সালের নাগরিক সূচীতে থাকতে হবে। এই ধারার তীব্র বিরোধিতা করে মুসলিম ছাত্র সংস্থা 'আমসু' বা অল অসম মাইনরিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন রাজ্য মন্ত্রিসভার নাগরিক পঞ্জীয়ন সূচী সম্পর্কিত উপসমিতি। 'আমসু' যে যে দফা বাদ দিতে বলেছিল তাই তাই বাদ দেওয়া হয়েছে। আগেকার আবেদনপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছিল— আবেদনকারীর নামের সঙ্গে জন্মস্থান, ঘরের নং, মৌজা, থানা, জেলা, রাজ্য ও দেশের নাম উল্লেখ করতে হবে। সংশোধিত আবেদন-পত্রে সেই সকল দফা বাদ দিয়েছে মন্ত্রিসভার উপসমিতি। আবেদনপত্রে মোট দফার সংখ্যাও ১৬ থেকে ১৫ করা হয়েছে।

এখন ঠিক হয়েছে যাদের পূর্বপুরুষদের নাম ১৯৫১ এবং ১৯৭১ সালের 'নাগরিক পঞ্জীয়ন সূচীতে নেই তাদের অন্যান্য নথিপত্র দাখিলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রেশন কার্ডকেও মান্যতা দিয়েছে মন্ত্রিসভার উপসমিতি। অন্য স্থান থেকে অসমে এসে বসবাসের কারণ এবং কবে থেকে সেই ব্যক্তি অসমে বসবাস শুরু করেছেন, এরকম বিষয়ও বাদ গেছে আবেদনপত্র থেকে।

দোহালিয়ার মুসলিম ডাকাতদের হাতে গুলিবিদ্ধ পিতা-পুত্র।

কয়েকমাস আগে নাগরিক পঞ্জীয়ন সূচী নবীকরণের বিষয় নিয়ে অসমের বরপেটা জেলায় দাঙ্গা এবং রক্তাক্ত ঘটনা ঘটার পরেই পাইলট প্রজেক্টের কাজ সাময়িক বন্ধ করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এতে সংখ্যালঘুদের ক্ষোভের মুখে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। শক্তিশালী ছাত্র-সংগঠন 'আসু' (All Assam Student Union) আপত্তি জানালেও তাকে গ্রাহ্যের মধ্যে নেননি মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার উপসমিতি। প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকা থেকে বিদেশী তথা বাংলাদেশীদের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে তীব্র গণআন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল আশির দশকে। ছাত্র-যুবদের সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল ছাত্রসংগঠন 'আসু'। 'আসু' এই সংশোধনের তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

'আসু'-র উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যের মতে, আবেদনপত্রে কোনও ত্রুটি ছিল না। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ''আবেদনপত্রে জন্মস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কেন বাদ গেল? এবার ভুল তথ্য দাখিল করে অবৈধ বিদেশীরাও নাগরিক সূচীতে নাম অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ পেয়ে যাবেন।'' তিনি আরও বলেছেন, সরকার যদি বাংলাদেশীদের রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে 'আসু' ঘোর বিরোধিতা করবে।

শৈবতীর্থ ঊনকোটি শুধু ভক্ত নয়, পর্যটকদেরও টানতে পারে

শৈবতীর্থ ঊনকোটি-পর্বতগাত্রে শিবমূর্তির অনুপম ভাস্কর্য।

ধর্মনগর (ত্রিপুরা) থেকে বাসুদেব পাল।। পর্বতগাত্রের উপলখণ্ডে শত শত শিব, চিত্রায়িত অনুপম ভাস্কর্য। গহন অরণ্যে অনাদরে রক্ষিত। না, অনাদর বললে একটু ভুল হবে। হাতে গোনা মুষ্টিমেয় চারজন ভক্ত আরাধনা করে চলেছেন ভগবান শিবের। তাঁদের একজন রক্তবর্ণের উত্তরীয় জড়ানো। হাঁটুমুড়ে শিরদাঁড়া টান টান করে ধ্যানমগ্ন। দেবাদিদেব যোগীন্দ্রের প্রস্তরমূর্তি বিরাজমান রয়েছে সেখানে।

স্থান, ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর ত্রিপুরা জেলার ঊনকোটি। মহকুমা শহর ধর্মনগর থেকে আন্দাজ ২০/২২ কিলোমিটার দূরে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েক কিলোমিটার আসার পর মূল রাস্তা থেকে প্রায় এক-দেড় কিলোমিটার জঙ্গলের ভিতরে একটি তোরণদ্বার। দ্বারেই লেখা শৈবতীর্থ 'ঊনকোটি'। মূল রাস্তা চলে গেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার সদর শহর কৈলাশহরে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা। প্রবেশদ্বার নতুন তৈরি করা। খুব বেশিদিনের পুরনো নয়। যদিও সরকার এলাকাটি সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করে রেখেছেন, তবুও কোনও সংরক্ষক (রক্ষী) চোখে পড়ল না। একটি পুলিশ ফাঁড়ির সাইনবোর্ড মাত্র চোখে পড়ল। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, চৈত্র সংক্রান্তির সময় মেলা বসে। তখনই সরকারি রক্ষীদের এখানে পোস্টিং হয়। হাজারে হাজারে ভক্তদেরও আগমন ঘটে। ত্রিপুরার জমাতিয়া সম্প্রদায় শৈব। শিবের উপাসক যে ক'জন ভক্ত ওখানে থাকেন তাঁরাও ওই জমাতিয়া সম্প্রদায়ের। একজনকে নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন বটে, তবে বোধগম্য হলো না।

তোরণ দ্বার থেকেই অনেক নীচের দিকে নেমে গিয়েছে সোপান শ্রেণী। সিঁড়ির ধাপ শতাধিক হবে। বেশিও হতে পারে। ডানদিকে বাঁদিকে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত যেদিকে তাকানো যায়— পাথরের গায়ে শিবমূর্তি আঁকা আছে। রয়েছে বিভিন্ন দেবী মূর্তিও। মূর্তি বলতে নীরেট পাথরের গায়ে চিত্র আঁকা রয়েছে। খাড়াই পাথর— শ'-দেড়শ ফুট তো হবেই। আবারও সিঁড়ি পথ উপরের দিকে উঠে গিয়ে কিছুটা সমতল। সেখানে একটা ঘেরা জায়গা, উপরে টিনের আচ্ছাদন। স্তূপীকৃত কয়েকটি পাথরে খোদিত শিব ও নন্দী। গোটা পাথরের নন্দীমূর্তি কিন্তু বেশ কয়েকটি জায়গায় আছে। সব থেকে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কবে কোন চিত্রকর এরকম এক নির্জন অরণ্য পর্বতগাত্রে এভাবে মূর্তি আঁকল! এটা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। ঊনকোটি নাম কেন? জনশ্রুতি— এক কম এককোটি বলে এর নাম ঊনকোটি। যতটা স্থান জুড়ে এরকম ভাস্কর্য ছিল তার সবটাই দেখলাম। তাতে পর্বত গাত্রে খোদিত চিত্র শতাধিক হতে পারে, তার বেশি নয়।

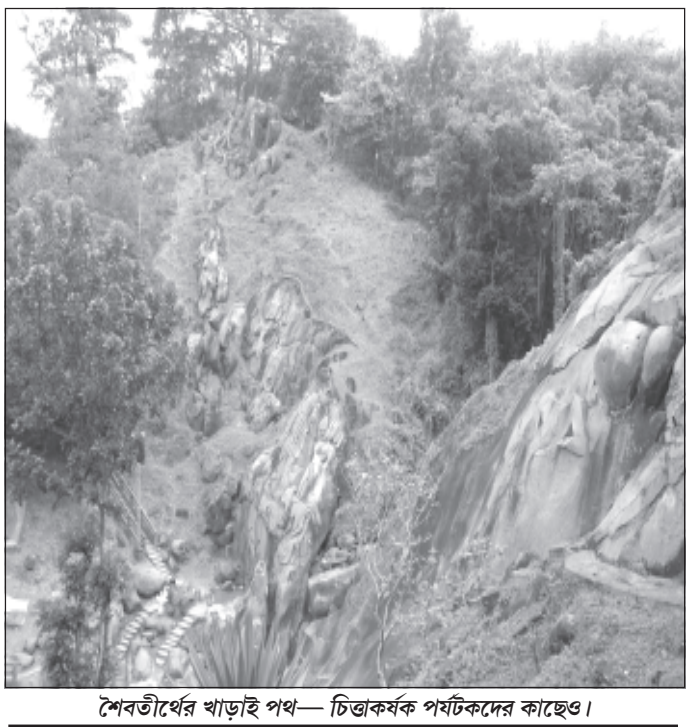

শৈবতীর্থের খাড়াই পথ— চিত্তাকর্ষক পর্যটকদের কাছেও।

তাহলে? ওয়াকিবহাল মানুষজনের মতে, যেগুলো সুন্দর ছিল, সেগুলো বাংলাদেশ হয়ে চোরাপথে পাচার হয়ে গেছে। কবে থেকে পাচার হয়েছে বা হচ্ছে তা কেউ জানে না। আমরা তিনজন যে পাহাড়ে উঠে ছিলাম তার উল্টোদিকে নামলেই বাংলাদেশ। সুতরাং পাচারকারীদের পক্ষে কাজটা বেশ সহজ। আর 'হেরিটেজ' স্বীকৃতি মিললেও ত্রিপুরার বাম সরকারের তেমন কোনও উদ্যোগই চোখে পড়ল না। অস্থায়ী থানা বন্ধ, অস্থায়ী বন্ধ রেস্টুরেন্টও চোখে পড়ল। তা শুধু মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের থেকে মুনাফা কামানোর জন্যই। ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে নানা আকারের অজস্র প্লাস্টিকের বোতল। তার মধ্যে বেশিরভাগই বাংলাদেশী নরম পানীয়— প্রাণ, লিচি ইত্যাদি। অথচ সারা ভারতে বোধকরি শিবভক্তরাই সংখ্যায় বেশি। সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে কেন্দ্র সরকার নজর দিলে ত্রিপুরা আরও ভক্ত ও পর্যটকের আকর্ষণ করতে পারবে। লাভের মুখ দেখবে ত্রিপুরা।

নীতিশ কুমারের দলের চেয়ে বিজেপির ফলাফল ভাল কেন?

সাধন কুমার পাল

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশ্লেষকরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন কংগ্রেসের ফলাফল নিয়ে। নির্বাচনী ময়দানে রাহুল গান্ধীকে 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে তুলে ধরে 'রাহুল ম্যাজিক'-এর তত্ত্ব আওড়ে এক শ্রেণীর বিশ্লেষক ও মিডিয়া এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছিল যে মনে হচ্ছিল ২৪৩টি আসনে এককভাবে লড়ে কংগ্রেস বিহারে তাদের হারানো জমি অনেকটাই পুনরুদ্ধার করতে পারবে। ঠিক যেমন কিনা 'রাহুল ম্যাজিক'-এর জেরে ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস ২১টি আসন দখল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এবার বিহারী ভোটারদের 'রাহুল ম্যাজিক' গেলানো গেল না, সেই সাথে মনমোহন সোনিয়ার মতো হাই প্রোফাইল জুটির যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থ হলো। বিহারে কংগ্রেস একরকম মুছে গেল। এ বিষয়ে 'রাহুল ম্যাজিকের' প্রবক্তাদের বক্তব্য হলো— দুর্নীতির জ্বলন্ত ইস্যু ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যই নাকি কংগ্রেসের এই শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ইউ পি এ সরকারের দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ইস্যু নিয়ে প্রায় একইরকম প্রেক্ষাপটে ভোট হয়েছে বছর দেড়েক আগে। উত্তরপ্রদেশে 'রাহুল ম্যাজিক' জ্বলে উঠলেও বিহারে তা নিভে গেল কেন?

এরকমই বিস্বাদ প্রশ্ন আরও আছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের উন্নয়নের ঝড়ে জাতপাতের ব্যাপারী ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের জীবন্ত স্ট্যাচু লালু-রামবিলাস উড়ে গেলেও তুলনামূলক বিচারে জে ডি (ইউ)-এর চেয়ে ছোট জোট সঙ্গী 'সাম্প্রদায়িক' বিজেপি-র ফলাফল আরও বেশি ভালো হলো কেন? ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশের রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য মহামূল্যবান মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক বা 'মুসলিম ফ্যাক্টর' নামক যে আলাদিনের প্রদীপটি আছে, প্রত্যেকটি নির্বাচনের আগে যেটিকে ঘিরে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও জল্পনা চলতে থাকে, বিজেপি-র মতো হিন্দুত্ববাদী বা 'সাম্প্রদায়িক' দল ও তার জোট সঙ্গী জে ডি (ইউ)-এর বিপুল জয়ের পর সেটির কথা কোনও বিশ্লেষকের বিশ্লেষণে উঠে আসছে না কেন?

এই সমস্ত জটিল প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর পেতে হলে উন্নয়নের ইস্যুর পাশাপাশি নির্বাচনের আগে ঘোষিত ঐতিহাসিক রামজন্মভূমি মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দলের ঘোষিত অবস্থান ও ভোটারদের উপর তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। কারণ, অযোধ্যা ইস্যুতে এক সময় দেশ উথাল-পাথাল হয়েছে। ফলে মিডিয়া বা কেতাবী বিশ্লেষকদের মনপসন্দ না হলেও ইস্যুটি যে ভোটের সময় আমজনতার উপর বেশ ভালভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর প্রভাবের প্রসঙ্গ এলে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে রামজন্মভূমি ইস্যুতে বিজেপি-র ঘোষিত অবস্থান আদালতের রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বিহারের নির্বাচনে জনমতের পাল্লা এই দলের দিকেই বেশি করে ঝুঁকেছে।

এই যুক্তিতে একমত না হয়ে যারা বলবেন, রামজন্মভূমি ব্যাপারটি একটি মৃত ইস্যু, তাদের কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন— রামজন্মভূমি, রামমন্দির ইস্যুটি যদি মৃত ইস্যুই হয় তাহলে ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টার সময় এলাহাবাদ হাইকোর্ট অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণার আগে পর্যন্ত গোটা দেশ উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে এমনটা মনে হচ্ছিল কেন? কেনই বা দেশের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল দেশবাসীকে শান্ত থাকার আবেদন জানাচ্ছিল। বিশেষ করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের তরফে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রিন্টমিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগণকে শান্ত থাকার আবেদন জানানো হচ্ছিল কেন? সরকারের কাছে কি খবর ছিল যে কোনও গোষ্ঠী দাঙ্গা বাঁধাবে? কিন্তু কোনও সূত্র থেকেই আজ পর্যন্ত সেরকম কোনও সম্ভাবনার কথা শোনা যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে— বিহার

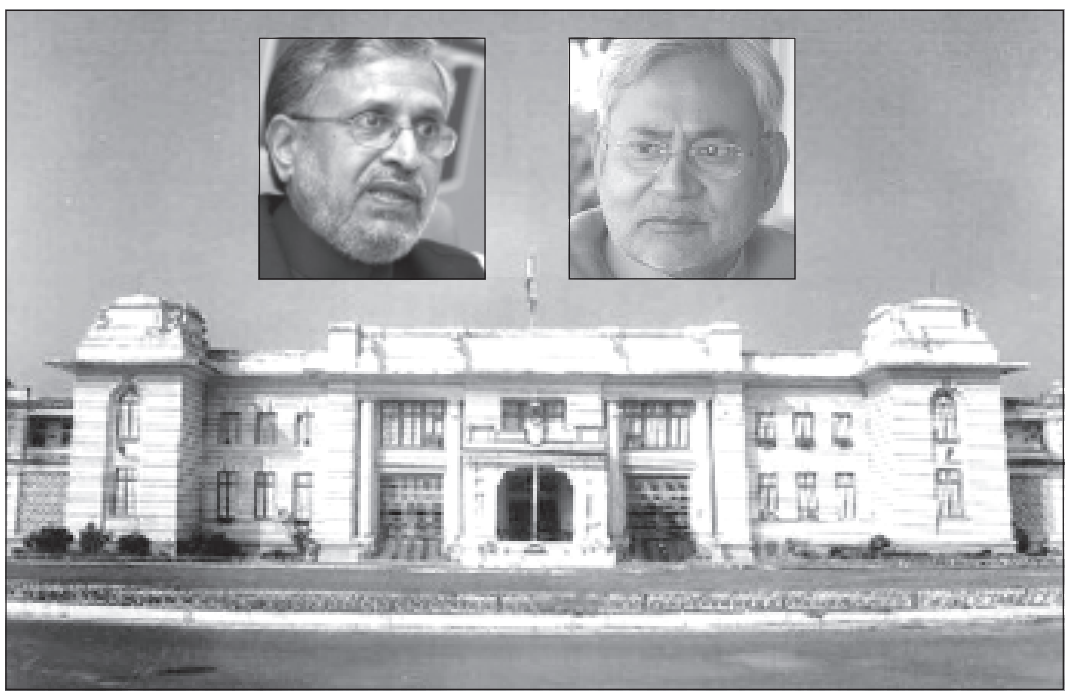

বিধানসভা নির্বাচনের আগে অযোধ্যা মামলার রায় নিয়ে এরকম একটি টান টান উত্তেজনার আবহ তৈরি করা হয়েছিল কেন? এই প্রশ্নের দুটো সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে। এক, কংগ্রেসের ম্যানেজাররা ধরে নিয়েছিল অযোধ্যা মামলার রায় হিন্দুদের বিপক্ষে গেলে সঙ্ঘ পরিবারের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। এবং সেক্ষেত্রে তারা বিভিন্নরকম আন্দোলন কর্মসূচীর পথে হাঁটবে। সেই সুযোগে একটি দাঙ্গা লাগিয়ে সঙ্ঘ পরিবারের গায়ে দোষ চাপিয়ে, সংখ্যালঘু মুসলমানদের গার্জেন সেজে বিহার নির্বাচনে রাহুল ম্যাজিক দেখিয়ে কিস্তি মাৎ করে দেওয়া যাবে। দুই, রায় হিন্দুদের পক্ষে গেলেও সঙ্ঘ পরিবার বিজয় মিছিল করবে এবং সেক্ষেত্রেও দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বিহার নির্বাচনে রাহুল ম্যাজিক দেখানো খুব একটা সমস্যা হবে না। কিন্তু রায় ঘোষণার পর যখন দেখা গেল দেশ অসম্ভব রকমেই শান্ত। বরং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন এগিয়ে আসছে আদালতের রায়ে নিষ্পত্তি না হওয়া অংশটি মিটিয়ে নিয়ে রামমন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত করে এদেশে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করতে।

কিন্তু, দেশজুড়ে এই ঐক্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ যে স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদীদের মনঃপূত হয়নি তা বোঝা গেল তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে। তারা বিভিন্ন রকম প্ররোচনামূলক বক্তব্য রেখে মুসলিম সমাজকে খেপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। যেমন সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাত বললেন, আদালত ভুল রায় দিয়েছে। লালু-মুলায়মের মতো নেতারা বললেন এই রায়ে মুসলমানদের ঠকানো হয়েছে। এটা তাদের মেনে নেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে কংগ্রেসের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি ভোল পাল্টানো সম্ভব ছিল না। ফলে তারা ঘুরিয়ে মুসলমানদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করল। বলল, এই রায় কোনও ভাবেই '৯২ সালের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঔচিত্য ঘোষণা করেনি। মসজিদ ধ্বংসকারীদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত ইত্যাদি।

এই সমস্ত মন্তব্যে মুসলিম সমাজের কাছ থেকে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত কংগ্রেস দল হিন্দু সংগঠনগুলোকে আক্রমণের পথ বেছে নিল। কোনওরকম প্রসঙ্গ ছাড়াই ভুপালে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করলেন নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির মতো আর এস এস সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। তার কয়েকদিন বাদে কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানের এ টি এস আজমির বিস্ফোরণের সাথে সঙ্ঘের সর্বভারতীয় কার্যকর্তা ইন্দ্রেশ কুমারের নাম জড়িয়ে হইচই বাধানোর চেষ্টা করল। এ আই সি সি-র অধিবেশন থেকেও একই রকম ভাবে আর এস এস-এর উপর সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তকমা লাগানোর প্রয়াস করা হলো। কংগ্রেসের এই প্রয়াসের সাথে যোগ্য সঙ্গত করল লালু রামবিলাসের মতো নেতারা।

অথচ, আর এস এস-এর গায়ে সন্ত্রাসবাদী তকমা লাগানোর প্রয়াসের ফল যে কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করল না ক্ষমতা পাগল গান্ধী পরিবার ও তার তাঁবেদারদের নিয়ে গঠিত কংগ্রেস দলের ম্যানেজাররা। বিগত এন ডি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিদেশ মন্ত্রী থেকে শুরু করে এক ডজনেরও বেশি মন্ত্রী, প্রায় দুইশত এম পি, প্রয়াত উপরাষ্ট্রপতি ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াত, বেশ কয়েকটি রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীর মতো দেশের নীতি নির্ধারকরা সরাসরি আর এস এস-এর সাথে যুক্ত। বর্তমানেও কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, লোকসভার শতাধিক সদস্য, প্রাক্তন সেনাকর্তা, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আর এস এস-এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত। বিদ্যাভারতী, বিদ্যার্থী পরিষদ, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মতো প্রভাবশালী সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্ব, রামজন্মভূমি, রামসেতু আন্দোলনের মতো সর্বকালের সর্ববৃহৎ আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা সন্ত-মহাত্মারা সরাসরি আর এস এস-এর সাথে যুক্ত। আর এস এস সন্ত্রাসবাদী হওয়া মানে এরা সবাই সন্ত্রাসবাদী। আর এরা সন্ত্রাসবাদী হওয়া মানে পাকিস্তানের সাথে সাথে ভারতের গায়েও লেগে যাবে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের তকমা।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে মহাত্মা গান্ধী, ডঃ বি আর আম্বেদকর, জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো সর্বজন-বরেণ্য ব্যক্তিরাও বিভিন্ন সময় এই সংগঠনটির সংস্পর্শে এসেছেন এবং সমাজ গঠনে সঙ্ঘের প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আর এস এস সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হলে এই দেশ বরেণ্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ও সন্ত্রাসবাদের

পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ উঠবে। সেইসাথে ভারতের গায়ে সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগাতে ভারতের শত্রুদের সহায়তা করবে, 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' বা 'গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ' বা জাতীয় পতাকার সর্বোচ্চস্থানে থাকা গেরুয়া রঙের নামে 'গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ'-এর মতো শব্দবন্ধ যা বহির্বিশ্বে অনেক সহজে গেলানো যাবে। সেই সঙ্গে এই তত্ত্ব এদেশে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের ক্রিয়াকলাপের ঔচিত্য প্রতিষ্ঠিত করবে। এতে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, উগ্র মোল্লা-মৌলভিদের 'মূল্যবান ভোট' ও প্রাণভরা সমর্থন বা পেট্রো ডলারের মতো আর্থিক সহায়তা পেয়ে এই তত্ত্বের প্রবক্তা মিডিয়া, ব্যক্তি ও দলের সাময়িক লাভ হবে বটে, কিন্তু দেশের গরিমা, সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুসলিম ভোট সংগ্রহ করার জন্য কংগ্রেসের এই দেশবিরোধী ক্রিয়াকলাপ বিজেপি কর্মীদের ভোটের ময়দানে মরিয়া করে তুলেছিল। ক্ষমতা পাগল কংগ্রেসের এই হীন প্রয়াস দেশপ্রেমিক হিন্দু মুসলমান কারও পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া সোনিয়া গান্ধী সম্পর্কে প্রাক্তন সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজীর তোলা অভিযোগকে আদালতে চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে কংগ্রেসীরা সারাদেশে আর এস এস বিরোধী বিক্ষোভের নামে যে দাঙ্গা-পরিস্থিতি তৈরি করেছিল সেটিও বিহারের ভোটাররা ভালভাবে নেয়নি। মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্র অংশ কট্টরপন্থী মোল্লা-মৌলভিরা কংগ্রেস, আর জে ডি, এল জে পি-র মতো দলগুলোকে ভোট দিলেও মাত্রাতিরিক্ত তোষণের জন্য প্রকাশিত নগ্নতার ফল গরিষ্ঠ-সংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলমান এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সবমিলে বলা যায়, এক্ষেত্রেই উন্নয়নের ইস্যুতে বিরোধীরা অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছিল। তার উপর অযোধ্যা মামলার রায়ের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি সামলাতে একাধিক ভুল পদক্ষেপ কংগ্রেসসহ অন্যান্য বিরোধীদের বিহারের মাটিতে অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে। জানি না স্বঘোষিত 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী'-রা ভবিষ্যতে এর থেকে কোনও শিক্ষা নেবে কিনা।

গোয়াড়িকর-এর ‘খেলে হাম জী জানসে’ ছায়াছবি

ইতিহাস বিকৃতি আজ তার হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

‘খেলে হাম জী জানসে’ (জান প্রাণ নিয়ে খেলেছি) নামের একটি হিন্দি ছায়াছবি এখন সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে কলকাতাতেও প্রদর্শিত হচ্ছে। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ছবির দৃশ্য বিন্যাস ও মেজাজ আগাগোড়াই রক্ষিত এমনটা বলা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ছবিটির পরিচালক শ্রী আশুতোষ গোয়াড়িকর ইতিমধ্যেই ভারতের ইতিহাস ভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে আন্তরিকতার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর লগন, যোধা আকবর, স্বদেশ ইত্যাকার ছবির, বিশেষ করে লগন ও স্বদেশ জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপায়ণে সমৃদ্ধ। লগন ছবিটি অস্কার মনোনয়ন পাওয়ার সঙ্গে বিদেশেও প্রভূত সাড়া ফেলেছিল। তবে সেখানে মনোরঞ্জনের রসদ ছিল একাধিক।

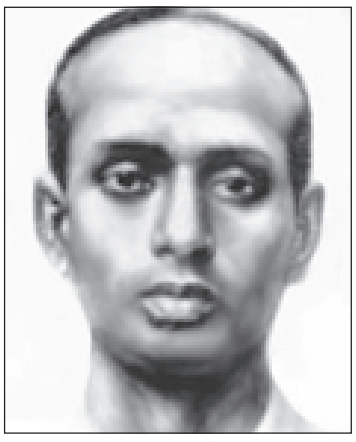

মাস্টারদা সূর্য সেন

মাস্টারদা সূর্য সেনের ভূমিকায় থাকা অভিষেক বচ্চন বা দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নির্মল সেনের চরিত্রাভিনেতা সিকান্দার খের ও সর্বোপরি অভিষেকের পিতা অমিতাভ বচ্চনও অকপটে স্বীকার করেছেন (টেলিগ্রাফ, ৩০.১১.১০) — সূর্য সেনের নাম তাঁদের অজানা। সিকান্দার সরাসরি বলেছেন, ইতিহাসের বইতে তিনি ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর, রাজগুরুর কথা পড়লেও সূর্য সেন কখনই না।

আশুতোষ গোয়াড়িকর পরিচালিত ‘খেলে হাম জী জানসে’ ছায়াছবির একটি দৃশ্য।

তুলনায় ইতিহাসের এক অবহেলিত পর্বের সিনেম্যাটিক প্রাণপ্রতিষ্ঠাই এ ছবির চালিকাশক্তি।

আলোচ্য ছবিটির নির্মাণ কুশলতা চলচ্চিত্র সম্মত নান্দনিক দিকগুলি কতটা ছুঁতে পেরেছে তা বিশেষজ্ঞের এক্তিয়ারভুক্ত হলেও মুখ্য বিচার্য নয়। আজ থেকে ৮০ বছর আগে পরাধীন ভারতে পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিপ্লবী (স্কুল মাস্টারমশাই) সূর্য সেনের পরিচালনায় যে দুঃসাহসিক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন পর্ব সংঘটিত হয়েছিল ছবিটি সেই বিস্মৃত গৌরবময় ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ পেশাদারী উন্মোচন। কিন্তু ছবিটি দেখার পর কতকগুলি অস্বস্তিকর প্রশ্ন বারবার খোঁচা দেয়। এমন একটি রক্তঝরা অধ্যায় সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ কেন? অবাক হবার কারণ বিবিধ। ছবিটির মুখ্য চরিত্র মাস্টারদা সূর্য সেনের ভূমিকায় থাকা অভিষেক বচ্চন বা দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নির্মল সেনের চরিত্রাভিনেতা সিকান্দার খের ও সর্বোপরি অভিষেকের পিতা অমিতাভ বচ্চনও অকপটে স্বীকার করেছেন (টেলিগ্রাফ, ৩০.১১.১০)— সূর্য সেনের নাম তাঁদের অজানা। সিকান্দার সরাসরি বলেছেন, ইতিহাসের বইতে তিনি ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর, রাজগুরুর কথা পড়লেও সূর্য সেন কখনই না। তাঁরা যুগপৎ লজ্জিতও হয়েছেন।

তাই এই লজ্জিত-বিস্ময়ের কারণটি অনেকের জানা থাকলেও বিশদ করার দরকার থেকে যায়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারত ইতিহাসের দেখভাল ও নিয়ন্ত্রণ যাঁরা করেছেন তাঁরা নিজেদের মুখে আলো ফেলতে এমন সব মৃত্যুপণ করা বীরদের ইতিহাসের পাতায় জায়গা দেননি। পরিষ্কার হওয়া ভাল, জাতির পিতার অহিংস লাইনের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের দৃপ্ত পথটি উত্তর-দক্ষিণ মেরুতে বিভাজিত হয়ে ব্রাত্য হয়ে পড়ে। যেখানে সুভাষচন্দ্র বসুও হেলায় spoilt child হয়ে যান। বীর সাভারকর তো অন্য গ্রহের জীব, হয়তো বা common enemy? অহিংসার ব্যক্তিগত দর্শনের প্রতিষ্ঠাই হয় আরাধ্য বিচার্য। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে সেই নিন্দার্হ, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি প্রলম্বিত হয়ে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের অধ্যায়কে একেবারেই ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় নামে, যা জাতির যৌথ ইতিহাস চেতনাকে পাকাপাকিভাবে বিকৃত করে দেয়। নইলে ছবিটির শিক্ষিত মূল চরিত্রাভিনেতারা মাত্র এই কয়েক দশক আগে মাতৃভূমির স্বাধীনতায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়া মানুষগুলির নাম পর্যন্ত শোনেনি! ইতিহাস বিকৃতি আজ তার হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছে।

যাই হোক, শ্রী গোয়াড়িকর হেলা-ফেলা করে ছবিটি করেননি, নিবিড় গবেষণার চিহ্ন ছবিতে ছড়ানো। বহু আগে বাংলায় তুলনামূলকভাবে টাট্‌কা অবস্থায় ‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন’ নামে একটি নড়বড়ে ছবি হয়েছিল, তার সর্বভারতীয় গ্রহণযোগ্যতা স্বাভাবিকভাবেই ছিল না। খবরে প্রকাশ, এই ছবির নির্মাণ খরচ প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। প্রযোজক অজয় বিজলী ও শ্রীমতী সুনীতা গোয়াড়িকর তাই অসীম ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। হায়, ছবিটির বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। ছবির মূল ঐতিহাসিক উপাদান শ্রীমতী মালিনী চ্যাটার্জীর ‘ডু এ্যান্ড ডাই’ নামের গবেষণা গ্রন্থটি থেকে আহৃত। বইটি পড়া না থাকলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়— স্বদেশপ্রেমের যে দুর্মদ আবেগে ১৩/১৪ বছরের কিশোর অকাতরে আত্মবলিদান দেয়, পরিচালক তাঁর লক্ষ্য স্থির রেখে সেই নির্ভীকতাকেই সেলাম জানিয়েছেন। মৃত্যুমুখী কিশোরদের শেষ অভিব্যক্তি তিনি পরম মমতায় চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। সশস্ত্র সংগ্রাম বিষয়বস্তু হওয়ায় রাতের বন্দুক যুদ্ধের দৃশ্যগুলি হলিউডি ছবির থেকে কোনও অংশে কম নয়। বলিউডের গ্ল্যামারময় অভিষেক (সূর্য সেন) ও কল্পনা দত্তের (ইনি পরবর্তী জীবনে কম্যুনিস্ট নেতা পি সি যোশীর সহধর্মিণী হন) ভূমিকায় দীপিকা পাড়ুকোন (ব্যাডমিন্টন স্টার প্রকাশ পাড়ুকোনের কন্যা) তাঁদের বলিউডি কেতা সর্বাংশে বর্জন করে চরিত্রানুগ আত্মস্থ অভিনয় করেছেন। ছবিটি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে সংরক্ষণযোগ্য ঐতিহাসিক দলিলের কাজ করবে। আর একটি বিষয়— ধুতি, কুর্তা, শাড়ির এমন সাবলীল ব্যবহার আমাদের নিজস্ব পোষাক হারানোর বেদনাকে মনে করায়। এর সমস্ত কৃতিত্বই পরিচালকের প্রাপ্য। আজকের ভুবনায়িত বাজারে আপাত মশলাহীন বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা বজায় রেখে উপভোগ্য ছবি করার ঝুঁকি নেওয়া ছোটখাটো ব্যাপার নয়।

গোয়াড়িকর ছবিতে ইঙ্গিত দিয়েছেন অস্ত্রাগার লুণ্ঠন পূর্ণ সাফল্য না পাওয়ার কারণ— (১) ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল (আক্রমণের দিন) ছিল ‘গুড ফ্রাইডে’। মান্যগণ্য বৃটিশ শাসকের সকলেই তাই ‘ইয়োরোপিয়ান’ ক্লাব থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যাওয়ায়, বিপ্লবীদের হাত থেকে বেঁচে যান (পরে এঁরাই প্রতি আক্রমণ করেন)। (২) অস্ত্রাগারের ভেতর পর্যাপ্ত বন্দুক পেলেও বিপ্লবীরা কার্তুজের সন্ধান পায়নি, ফলে প্রত্যাঘাত রোখার মত রসদ তাদের ছিল না। এগুলি আগে থেকে নির্ধারণ করা যায় না। তাই এই অভ্যুত্থান যে বালখিল্যের অ্যাডভেঞ্চার নয় তা সহজেই অনুমেয়। এমন দৈহিক সংঘাতের মোকাবিলার মাঝেও ছবির মানবিক দিকের কথা একটু বলে শেষ করব। সংঘর্ষরত লোকনাথ বল চোখের সামনে কিশোর ভাই-কে (টেগরা) গুলিতে নিহত হতে দেখে যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন বা অকুতোভয় কিশোরদের মৃতদেহগুলি পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়ার দৃশ্যে গুলিবিদ্ধ নিরুপায় অম্বিকা চক্রবর্তীর কান্না অভিনয় সৌকর্যে মর্মস্পর্শী।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারত ইতিহাসের দেখভাল ও নিয়ন্ত্রণ যাঁরা করেছেন তাঁরা নিজেদের মুখে আলো ফেলতে এমন সব মৃত্যুপণ করা বীরদের ইতিহাসের পাতায় জায়গা দেননি। পরিষ্কার হওয়া ভাল, জাতির পিতার অহিংস লাইনের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের দৃপ্ত পথটি উত্তর-দক্ষিণ মেরুতে বিভাজিত হয়ে ব্রাত্য হয়ে পড়ে।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর অনন্ত সিং, গনেশ ঘোষ, লোকনাথ বলের দ্বীপান্তর হয়। শেষ দৃশ্যে ফাঁসির ঠিক আগে সূর্য সেনকে সব নিয়মনীতি ভেঙ্গে পুলিশ তাঁকে সেলের মধ্যেই অকথ্য নির্যাতন করে। রক্তাক্ত, অক্ষম সূর্য সেন দুই কনস্টেবলের কাঁধে ভর দিয়ে ফাঁসির মঞ্চের দিকে যান। রক্ষীরা তাঁকে কোনরকমে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে। বৃটিশ অফিসার উড্ডীয়মান ‘ইউনিয়ন জ্যাকের’ দিকে সূর্য সেনকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়ে যায়। স্বপ্ন কল্পনায় ততক্ষণে অপসারিত হয়ে যায়— ইউনিয়ন জ্যাক, অন্তিম মুহূর্তে যেখানে মাতৃভূমির ত্রিবর্ণ পতাকাকে প্রত্যক্ষ করেন মাস্টারদা সূর্য সেন। বাকরোধিত রক্তাক্ত মুখে ‘বন্দে মাতরম’ অনুচ্চারিত থেকেই মহাবিপ্লবী সূর্য সেনের ফাঁসি হয়। অমর শহীদদের প্রণাম জানাই ও দায়বদ্ধ গোয়াড়িকরকে ভারতবাসীর কাছে মাস্টারদাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। সুযোগ পেলে সকলকে ছবিটি দেখতে অনুরোধ করি।

স্বামী অসীমানন্দকে গ্রেপ্তারের নেপথ্যে

খৃস্টানদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেওয়াতেই মরিয়া চার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এখন আর এটা কোনও গোপন ব্যাপার নয় যে, সারা বিশ্বের আগ্রাসনবাদী চার্চগুলোর বর্তমানে একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে ভারতবর্ষ। বিশ্বের বুকে চার্চের রাজত্ব স্থাপন করতে গেলে তাতে ভারতবর্ষের হিন্দুদের যুক্ত করাও বিশেষ দরকার। কেননা ভারতবর্ষের মতো একটা বহু ভাষা-ভাষী দেশকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে সনাতন ধর্ম, যা নামান্তরে হিন্দুত্ব। সুতরাং এই আদর্শের মানুষকে কখনওই চার্চ-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না বুঝে পাদ্রীরা নতুন চাল খেললেন। তাঁরা হতদরিদ্র, নিরক্ষর এবং বনবাসী হিন্দুদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিলেন। নিজস্ব ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করে এদেরকে ধর্মান্তরিত করা চলছিল চার্চের প্রত্যক্ষ মদতে। এমনকী তাঁদের সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনাকেও সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল চার্চ। খৃস্টান ধর্মান্তকরণ যে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদে বিশেষ সহায়ক তার প্রমাণ উত্তর-পূর্ব ভারত। এই উত্তর-পূর্ব ভারতে বর্তমানে বহু জায়গা রয়েছে যেগুলোকে খৃস্টান মিশনারী ও পাদ্রীদের শক্ত ঘাঁটি বলা চলে। তবে শুধু উত্তর-পূর্বেই নয়, পশ্চিমভারতে গুজরাটের ডাংস-ও ছিল এহেন একটা জায়গা।

জনজাতি হিন্দুরা বহুবছর ধরে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের সীমা সংলগ্ন এই ডাংস এলাকায় রয়েছেন। ডাংস জেলায় মোট ৩৫২ টি গ্রাম। জেলা-সদর হলো আহ্ওয়া-য়। মহারাষ্ট্রের নবপুর গুজরাটের ডাংস জেলার খুব কাছেই অবস্থিত। ডাংস জেলায় প্রথম চার্চ স্থাপিত হয় ১৯০৪ সালে। সেই থেকেই খৃস্টান ধর্মান্তরকরণের সূচনা হয় এখানে। তবে ১৯৯১ থেকে ২০০১ এই ১০ বছরে প্রায় ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় খৃস্টান জনসংখ্যা। স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টার মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদের আভাস দেখা যায় তখনই। অস্থায়ী ছাউনি দিয়ে তৈরি চার্চগুলোকে যত্রতত্র অবৈধভাবে গজিয়ে উঠতে দেখা যায় তখনই। এই চার্চগুলো 'অবৈধ', কারণ এগুলির পঞ্জীকরণ করা হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গিয়েছে এই চার্চগুলোই দেশ-বিরোধিতার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

স্বামী অসীমানন্দের পদার্পণ

স্বামী অসীমানন্দের জন্ম বাংলায়। আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তিনি জীবনের অনেকগুলি বছর কাটিয়েছেন। একটা সংকটময় পরিস্থিতিতে

শবরী কুম্ভ মেলার জন্য নির্মিত পম্পা সরোবর।

তিনি জনজাতিদের পাশে এসে দাঁড়ান। তাদের অনেককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনও করান তিনি। তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও বক্তৃতা এক্ষেত্রে হিন্দু-জাগরণের পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী হয়। স্বাভাবিকভাবেই ডাংস-এ এসে খৃস্টান পাদরীদের আচমকাই রোষের মুখে পড়ে যান তিনি। তাঁকে ভাড়াটে খুনী দিয়ে খুন করারও চেষ্টা হয়। ভাগ্য জোরে বেঁচে যান তিনি। তবে এতে ভয়ও পেয়ে যাননি। বরঞ্চ তাঁর ওপর যত এধরনের আক্রমণ হয়েছে, ততই ডাংসের মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছেন তিনি। গেরুয়া পরিহিত এই সন্ন্যাসী ডাংসে পদার্পণ করেছিলেন ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে। এসেই তিনি হনুমানের ছবি দিয়ে প্রায় শ' পাঁচেক লকেট তৈরি করেন। সেখানকার জনজাতিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি বলতেন— 'তুমি কি হিন্দু, না খৃস্টান?'। এরকমই একজন কেউ হয়তো বলেছে যে 'আমি হিন্দু', অমনই অসীমানন্দ বলতেন, 'আমি আজকের রাতটা তোমার বাড়িতে থাকতে পারি?' তখন সেই হিন্দু ব্যক্তিটি স্বামী অসীমানন্দকে তার বাড়িতে সাদরে অভ্যর্থনা করতো। তখন তিনি তার বাড়িতেই থাকতেন। বাড়ির বাচ্চাদের হনুমানের ছবিযুক্ত লকেট উপহার দিতেন। বিকেলবেলা তাদের রাম-কথা শোনাতেন। এভাবেই স্বামী অসীমানন্দ মিশে যেতেন সেইসব হিন্দু পরিবারগুলোর সঙ্গে। এভাবেই তিনি একদিন আয়োজন করে ফেললেন ধর্মসভার। খৃস্টান মিশনারীরা তাঁকে হুমকি দিতেন। জিজ্ঞাসা করতেন— 'কি করতে এসেছ এখানে?' অসীমানন্দ মৃদু হাস্যে উত্তর দিতেন— "আমরা এখানে এসেছি মানুষের সেবা করতে।" সেই থেকেই খৃস্টানদের বিষনজরে পড়ে যান তিনি। তবে এভাবে হিন্দুত্ব জাগরণের কাজটা ভালভাবেই করছিলেন অসীমানন্দ।

ডাংসে হিন্দুত্ব জাগরণ

১৯৯৮ সালে, মাত্র দু'মাসের মধ্যে প্রায় ২৫,০০০ খৃস্টান স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বামী অসীমানন্দ শুধু হিন্দুদের বাড়িতেই যেতেন না। ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়া খৃস্টানদের বাড়িতেও যেতেন। তাদের নিদারুণ দুঃখ, দারিদ্র্যের নিয়মিত সাথী ছিলেন তিনি। ফলে সেই সমস্ত জনজাতি খৃস্টানরাও নিজধর্মে ফিরতে শুরু করেছিলেন। ডাংসের জনজাতিদের কাছে সেই সময় একটি জনপ্রিয়তম স্লোগান ছিল— 'হিন্দু জাগে, খৃস্টী ভাগে।' ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ মাত্র এই ছ'টি বছরে অন্তত ৫৫টি বিশাল হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ডাংসে। অন্তত চার লক্ষ হিন্দু এইসব সম্মেলনগুলোতে যোগদান করেছিলেন। আর এতেই স্বামী অসীমানন্দের ওপর খৃস্টানদের ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

অসীমানন্দের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েও জনজাতিদের কাছে তাঁকে অপদস্থ করা যাচ্ছে না বুঝে অন্য চাল খেলল চার্চ কর্তৃপক্ষ। একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যমকে টাকা দিয়ে প্রায় কিনে ফেলল তারা। বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশিত হলো বিশ্বের খৃস্টান প্রধান প্রায় ৪০টি দেশে। আন্তর্জাতিক চাপ একটা ছিলই, তার ওপর স্থানীয় আদালত খৃস্টমাসের সময় হিন্দুদের যে কোনও 'পাবলিক সেরিমনি' বা প্রকাশ্যে উৎসব নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু অসীমানন্দের নেতৃত্বাধীন হিন্দুরা তাতে আদৌ দমে যাবার পাত্র ছিলেন না। ২০০২-তে তাঁরা রামায়ণ কথাকার খ্যাত মুরারি বাপুকে ডাংসের মানুষকে রামকথা শোনানোর জন্য আহ্বান করেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আসেন মুরারি বাপু। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বারবার করে 'শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতিধন্য ডাংসে'র কথা উল্লেখ করেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যেখানে শবরীমাতা ও রামচন্দ্রের মিলন হয়েছিল বলে কথিত সেই ঐতিহাসিক স্থানে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি কুম্ভের আয়োজন করা হোক। মুরারি বাপুর পরামর্শেই ডাংসে সূচনা হলো শবরী কুম্ভের।

শবরী কুম্ভ

একে দুর্গম এলাকা, তায় ঘন-জঙ্গল। কিন্তু শবরী কুম্ভের আয়োজনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটেনি। ৩৫২টি গ্রাম নিয়ে গঠিত ডাংসে না ছিল রাস্তাঘাটের সুবিধা, না ছিল বিদ্যুতের বন্দোবস্ত। একমাত্র শহর মতো এলাকা হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা যায় সেই জেলা-সদর আহ্ওয়া থেকে কুম্ভের এলাকাটি নিদেনপক্ষে ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। চিকিৎসার ন্যূনতম পরিষেবাটুকুও ছিল জনসাধারণের নাগালের বাইরে। এই শরবীকুম্ভকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ও আরও অন্যান্য সমমনস্ক সংগঠনগুলি পূর্ণ উদ্যামে কাজে নামলো। জনজাতিদেরও এ নিয়ে আশ্বস্ত করতে নরেন্দ্র মোদীর গুজরাট সরকার শবরী কুম্ভের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। বছর-খানেক ধরে এ নিয়ে পরিকল্পনা করে কুম্ভের জন্য ২০০ থেকে ২৫০ হেক্টর জমি নেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শুরু হয় রাস্তা তৈরির কাজও। ৩৫২টি গ্রামেই পৌঁছে যায় বিদ্যুৎ। পম্পা সরোবর যেখানে পবিত্র স্নান অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ২২টি জলাধার নির্মিত হয় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। ডাংসকে ঘিরে ৮০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ২০ লক্ষ বনবাসী তাঁদের বসতি গড়ে তোলেন। শবরী কুম্ভের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের ৫০০০ গ্রামকে সমীক্ষার মধ্যে আনা হয়। এর মাধ্যমে ৩০-৩৫ লক্ষ জনজাতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। শেষ পর্যন্ত ৬ লক্ষ হিন্দু যোগদান করেন কুম্ভে। এর মধ্যে অন্তত দু'লক্ষ মানুষ তিন দিন ধরে কুম্ভে ছিলেন। এদের থাকবার জন্য ৫০০০ মানুষ থাকতে পারে এমন একের পর এক 'টাউনশিপ' গড়ে তোলা হয়, কমপক্ষে এরকম ৪০টি টাউনশিপ গড়ে ওঠে। স্বামী অসীমানন্দের তত্ত্বাবধানে প্রতিটা টাউনশিপে ব্যবস্থা অর্থাৎ নিরাপত্তা, খাদ্য, চিকিৎসা বিভাগ সামলানোর জন্য ১০০ জন করে কর্মীর বন্দোবস্ত করা হয়। সবমিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে যে অন্তত ৪০০০ কর্মী লেগেছিল স্রেফ 'টাউনশিপ'-এর ব্যবস্থায়। এছাড়াও ছিলেন অতিরিক্ত হাজার দু'য়েক কর্মী।

এই কুম্ভকে ঘিরে খৃস্টান মিশনারীদের স্বামী অসীমানন্দের ওপর রাগটা গিয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কুম্ভে অংশগ্রহণকারী ৩৮৮টি বনবাসী জাতি ও ১৩৭টি শহরে সম্প্রদায় ছিল খৃস্টানদের চিরাচরিত 'টার্গেট'। তাদের মুখের গ্রাস অসীমানন্দ এভাবে ছিনিয়ে নেওয়ায় মরিয়া হয়ে ওঠে চার্চ। সর্বোপরি ৮০০ জনজাতি সাধু সমেত সারা দেশ থেকে আসা ধর্মপ্রচারকরা কুম্ভে যোগদান করায় খৃস্টানদের ক্রোধ অধিকতর বৃদ্ধি পায় স্বামী অসীমানন্দের প্রতি।

কুম্ভে যোগদানকারী প্রত্যেককে তার ইষ্টদেবতার একটি লকেট উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। সবমিলিয়ে ২০ লক্ষ লকেট, ৫ লক্ষ হনুমান চালিশা, ৫ লক্ষ গৈরিক পতাকা বিতরণ করা হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, স্বামী অসীমানন্দের স্বদেশপ্রেমের এই পরাকাষ্ঠা খৃস্টান মিশনারীদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক্ষেত্রে ওড়িশার কান্ধামালে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীর নিয়তিই ভবিতব্য ছিল অসীমানন্দের। স্রেফ ভগবানের আশীর্বাদে বারবার খৃস্টান মিশনারীদের হাতে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসেছেন তিনি। মিশনারীরা পেশীশক্তি দিয়ে স্বামী অসীমানন্দকে ঘায়েল

নবনির্মিত শবরীধাম মন্দির।

করতে পারছে না বুঝে মাঠে নামে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার। এই ইউ পি এ-ই হলো স্বামী অসীমানন্দ গ্রেপ্তারের মূল ষড়যন্ত্রী। এই সন্ন্যাসীর নামে অন্যায়ভাবে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁর কাজ ও তাঁকে জনজাতি মানুষের মন থেকে নিশ্চিহ্ন করতেই সোনিয়া কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

মেকী ধর্মনিরপেক্ষী

গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল তা থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন। এ দাঙ্গায় মৃত্যু হয়েছিল এহমণি জাহরীর। গুজরাত দাঙ্গায় তদন্ত রিপোর্টের পরেও যখন নরেন্দ্র মোদীকে ফাঁসানো গেল না তখন কংগ্রেসী মাতব্বরেরা এবং সোনিয়া গান্ধী নেপথ্যে থেকে জাহরির স্ত্রীকে দিয়ে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে অভিযোগ করানো হয়। প্রকাশ্যে মদত দিতে থাকেন মুসলমান বিবি তিস্তা শীতলাবাদ, বৃন্দা কারাত সহ আরও অনেকে। সোনিয়া গান্ধী তো মোদীকে "মৌৎ কা সওদাগর" বলে খিস্তি করেন। তার কী ফল হয়েছে তা সোনিয়া ও কংগ্রেসের নেতারা গুজরাটে নির্বাচনগুলিতে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। আর শীর্ষ আদালত রাঘবনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্তকারী দল সিট-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে নরেন্দ্র মোদীকে নির্দোষ বলে বিরোধীদের মুখে ঝামা ঘসে দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে কংগ্রেস ও ডি এম কে তথা ইউ পি এ সরকার নাজেহাল— বার বার সংসদ মুলতুবি করা হচ্ছে জে পি সি তদন্ত করা হবে না বলে। বিরোধীরাও জে পি সি তদন্তে অনড়। অন্যদিকে অন্ধ্রের কংগ্রেস দলের ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাহুল গান্ধী যদি প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবীদার হয় তাহলে জগনমোহন তার পিতা স্বর্গীয় রাজশেখর রেড্ডীর পুত্র হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে না কেন? আদর্শ সোসাইটি, স্পেকট্রাম, এল আই সি ব্যাঙ্ক লোন স্ক্যাম, কমনওয়েলথ গেমস স্ক্যাম, সি ভি সি ঘোটালা ইত্যাদিতে লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি করে সোনিয়া কংগ্রেস ও তার ম্যানেজাররা মনমোহন, চিদাম্বরম, প্রণব মুখার্জীরা কি করে মুখ দেখান? বলা হয়েছে মনমোহন সৎ লোক। যদি তাই হয় তাহলে কি কারণে তিনি প্রথমেই এ রাজা-কে বরখাস্ত করেননি কেন? কেনই বা গেমসের পূর্বেই ঘোটালার রাঘববোয়ালদের ছাঁটাই করে জেলে পাঠাননি? মনে রাখতে হবে অধিকাংশ ধর্মনিরপেক্ষী মেকী ও ভেজাল, তাদের শনাক্ত করে শাস্তি দিতে হবে।

—বৈদ্যনাথ ঘোষ, ন'পাড়া, বারাসত।

উপাসনা গৃহ

সল্ট লেকের বিকাশ ভবন চত্বরে 'উপাসনা গৃহের' নামে একটি মসজিদ গড়ে উঠেছে। অথচ সুপ্রিম কোর্টের রায় আছে অফিস চত্বরে ধর্মীয় গৃহ নিষিদ্ধ। মুসলিম ভোটের প্রশ্ন জড়িত বলে এ ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দল চুপ। সুতরাং নিঃশব্দে, নিভৃতে বেড়ে উঠছে এই বিষবৃক্ষ। সেখানে নিয়মিতভাবে চলছে ধর্মীয় সমাবেশ। কিন্তু সরকারী জায়গায় আমলা-অফিসারদের নাকের ডগায় ওই মসজিদ গড়ে উঠল কিভাবে? মূলত জায়গাটি ড্রাইভারদের বিশ্রামগৃহ ছিল। পুরো বাড়িটি সেচ ভবনে অবস্থিত ইউ ডি ডিপার্টমেন্ট-এর দায়িত্বে রয়েছে। অতএব সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে যে কোনও শয়তানের মস্তিষ্কপ্রসুত এই অপকর্মের পেছনে একাধিক সরকারী অফিসার, কর্মচারী ও সংগঠনের মদত আছে। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? অবিলম্বে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন এন জি ও-রা সতর্ক হোন এবং মানুষকে এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত করে এর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা শুরু করে দিন। ওই মসজিদ বা প্রার্থনাগৃহটি বরং ইন্দিরা ভবনের পাশে অবস্থিত আলিয়া ইউনিভার্সিটি ভবনটির কোনও একটি তলে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।

—শুভ্রজ্যোতি চক্রবর্তী, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪।

পণ্যের বিজ্ঞাপন

বর্তমান আধুনিক সভ্যতাকে বিজ্ঞাপনী সভ্যতা বলে অভিহিত করা যায়। বিজ্ঞাপনই সকল পণ্যদ্রব্যের মান নির্ণয় করার কাজে প্রধান সহায়ক। কিন্তু বিজ্ঞাপনের নাম করে যে চটকদারী বিজ্ঞাপন নির্মাণকারী ও প্রচারকারী সংস্থাগুলি করে চলেছে তার বিষময় ফল ফলতে শুরু করেছে। যেভাবে অশালীন দৃশ্যাবলী উপস্থাপনের মাধ্যমে ভারতীয় দর্শকদের ভোলানোর চেষ্টা চলছে তা এককথায় সম্পূর্ণ ভাঙনের দিকেই নিয়ে যাবার অপচেষ্টা। নগ্নতা, অশ্লীলতা, কুরুচি, অশালীনতা ইত্যাদি শব্দগুলি আজ মডার্ন তথা প্রোগ্রেসিভ। যাঁরা এসবের বিরোধিতা করেন তাঁরা সকলেই নাকি ব্যাক-ডেটেড ও সমাজকে পিছিয়ে দেবার চক্রান্তে লিপ্ত! ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী বিজ্ঞাপনের বাহার বন্ধে কোনোরকম সরকারি উদ্যোগ সেভাবে চোখে পড়ছে না। জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে এই বিষয়ে জনমত গঠন করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণে অনুরোধ জানাই।

—সুকান্ত আওন, বিষ্ণুবাটি, জামালপুর, বর্ধমান।

দেগঙ্গা কি পাকিস্তান!

৬, ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে জঙ্গি মুসলমানদের দ্বারা দেগঙ্গার কয়েকটি গ্রামে হিন্দুদের উপর পূর্বপরিকল্পিত বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদে দেগঙ্গায় বিজেপি আয়োজিত জনসভা (৮.১০.১০) হয়েছে। সেখানে যাওয়ার পথে বেলিয়াঘাটায় দেখা গেল একটি পাকিস্তানী পতাকা উড়ছে।

পাকিস্তানের পতাকা ওড়ানোসহ এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে কাদের হাত আছে সে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করার দায় সরকারের। সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারতে পাকিস্তানী পতাকা ওঠানো রাষ্ট্রদ্রোহিতা। কিন্তু মুসলমানদের আচরণ দেখে বোঝাই যায় তারা সরকারকে থোড়াই কেয়ার করে।

আশ্চর্য, দেগঙ্গার হিন্দুদের উপর তিনদিন ধরে জঙ্গি মুসলমানদের বর্বর অত্যাচারের এতবড় ঘটনা মিডিয়াগুলি প্রচার করেনি। কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা সেখানে যায়নি। একমাত্র বিজেপি দেরীতে হলেও সেখানে মিটিং করেছে। অথচ সে খবর মিডিয়াগুলি প্রকাশ করেনি। রাজনৈতিক দল ও মিডিয়াগুলির এই উদ্দেশ্যমূলক নীরবতা খুবই লজ্জাকর ও ধিক্কারযোগ্য। এবং তা সমাজের অধোগতির পরিচায়ক।

—অক্ষয় কুমার দাস, বিবেকানন্দ পল্লী, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা।

হিন্দুর ধৈর্যের পরীক্ষা

চন্দননগরের ঐতিহ্যশালী জগদ্ধাত্রী পূজা সর্বজনবিদিত। এখানকার প্রতিমার বিশালত্ব এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকসজ্জা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করে। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা একটা দর্শনীয় বিষয়। তাই ওই দিন কয়েক লক্ষ দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে চন্দননগরে। চন্দননগর, মানকুণ্ডু ভদ্রেশ্বর মিলিয়ে প্রায় দুশোর মতো পূজা হয়। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় পূজা কমিটি নিয়ন্ত্রিত শোভাযাত্রায় ৬০-৬৫ টির মতো প্রতিমা অংশ গ্রহণ করে। বিসর্জনের দিন শোভাযাত্রায় অংশ না নেওয়া প্রতিমাগুলির সকাল ১০টা-১১টা থেকে বিসর্জন দেওয়া শুরু হয় এবং চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এরপর সন্ধ্যেয় আলোকসজ্জাসহ প্রতিমাগুলির শোভাযাত্রা শুরু হয়। সারারাত শোভাযাত্রা হয়। আলোকসজ্জাসহ এই শোভাযাত্রা কয়েক লক্ষ মানুষ অধীর আগ্রহে প্রত্যক্ষ করেন। সমস্ত প্রতিমা শোভাযাত্রা শেষ হলে একাদশীর দিন সকাল থেকেই বিসর্জন দেওয়া হতে থাকে এবং ওইদিন বেলা দুটো-তিনটের মধ্যেই সব প্রতিমার বিসর্জন হয়ে যায়।

কিন্তু এ বছর (২০১০) ১৭ নভেম্বর ইদুজ্জোহা থাকায় নির্দেশ জারি হয়েছিল ১৭ নভেম্বর একাদশীর দিন ভোর ৫টা থেকে বেলা ১০টা পর্যন্ত শোভাযাত্রা বা প্রতিমা নিরঞ্জন বন্ধ রাখতে হবে। সে কারণে চন্দননগরের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা উর্দিবাজারের বড়রাস্তা দুদিক থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে কোনও লোকজন, গাড়ী ঢুকতে না পারে। ভোর থেকে বেলা ১০টা পর্যন্ত চন্দননগর ছিল নিস্তব্ধ। লাউড স্পিকার, ঢাক, ঢোল, বাজনা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। বিরাট বিরাট প্রতিমাগুলি রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। উৎসব মুখর, কোলাহল মুখর চন্দননগর পরিণত হয়েছিল নিস্তব্ধ নগরে। বেলা ১০টা থেকে প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয়। তবে কিছু কিছু প্রতিমা ঢাক ঢোল বাজনা ছাড়াই বিসর্জনের জন্য গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়, হয় তো বা প্রতিবাদ স্বরূপ। উর্দিবাজারের পাশেই 'কুঠির মাঠ' নামে একটি বিরাট খেলার মাঠ থাকা সত্ত্বেও বড়রাস্তা অবরোধ করে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করে প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

অবশ্য এতে জগদ্ধাত্রীর ভক্তদের মধ্যে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য এটুকু স্বার্থত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। 'হিন্দু' ঔদার্য্য আর সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে। আর সেই ঔদার্য্য আর সহিষ্ণুতার মাথায় নাগরা পরা পা রেখে মুসলমান হিন্দুর ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। আর কত পরীক্ষা দেবে হিন্দু?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দননগর-৭১২১৩৬।

'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক' মানতে নারাজ বামফ্রন্ট সরকার

শ্যামাপ্রসাদ দাস

সম্প্রতি বিড়ি সিগারেটের মতো ধূমপানের উপকরণ এবং খৈনি, গুটখা, পানমশলা ইত্যাদি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বস্তুর ব্যবহার কমাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে বামপন্থী সংগঠন অল ইন্ডিয়া বিড়ি ইন্ডাস্ট্রি ফেডারেশন। ফেডারেশনের আহ্বায়ক এক লিখিত বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীসহ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট সচিবকেও লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই বিস্ময়কর ঘটনা নিয়ে এখন চারদিকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মধ্যে শুরু হয়েছে নানারকম বিতর্ক।

বৃটিশ জমানায় এবং স্বাধীনতার পরবর্তী কালের প্রায় এক দশক পর্যন্ত সারাদেশে অসংখ্য অফিসের দোকান ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্য নিষ্কন্টক রাখার জন্য সাধারণ মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার এটাই ছিল তখন একটা প্রধান অপকৌশল। এর সঙ্গে বিলিতি মদো-মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির কৌশলটিকেও তারা কার্যকর করেছিল। এইসব কর্মসূচীকে বানচাল করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। সেই কর্মসূচী রূপায়িত হতে থাকে স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও। ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হয় সমস্ত অফিমের দোকান। মদের দোকানের উপরেও নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ধূমপানের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা হয় নানারকম সতর্কীকরণ বিধিনিষেধ। কিন্তু এই বিধিনিষেধ মানতে রাজি নয় বামপন্থী সরকার এবং সংগঠনগুলো। তারা এই পরিকাঠামোটিকে ভেঙে ফেলার জন্য নানারকম কর্মসূচি পালন করেই চলছে। যেমন বিড়ি। প্রধানত ধূমপানের জন্য বিড়ি গরীব মানুষের মধ্যে প্রচলিত। এর সঙ্গে আছে খইনি, গুটখা, পান-পরাগের মতো তামাক জাতীয় বস্তু, যা ক্যানসার রোগের জন্ম দেয়। এর প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যেসব কর্মসূচি রূপায়িত করে চলছে, এখানে তার একটি বিজ্ঞাপিত কর্মসূচি তুলে ধরা হলো—

এক : পশ্চিমবঙ্গ বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প। যেখানে ২০ জনের কম বিড়ি শ্রমিক এক সাথে কাজ করে, এমন অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎনিধি ও বিদ্যুতায়ন। বিড়ি শ্রমিকদের গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য রাজ্যসরকার ২,৫০০ টাকা সমহারে প্রদান করে থাকে।

দ্বিতীয়টি হলো, বিড়ি শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণের অনুদান। গৃহ নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার বিড়ি শ্রমিকদের প্রত্যেককে দুটি সমান কিস্তিতে ১০,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য হিসেবে মোট ৪০,০০০ টাকা দিয়ে থাকে। তৃতীয়টি হলো বিড়ি শ্রমিকদের পরিকাঠামোর উন্নয়ন। যেখানে বিড়ি শ্রমিকরা নিবন্ধিকৃত সমবায় আবাসন সমিতি গঠন করবেন, রাজ্য সরকার সেক্ষেত্রে গ্রুপ হাউসিং-এর পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য শ্রমিক প্রতি ১০,০০০ টাকা প্রদান করেন এবং প্রয়োজনে রাজ্য সরকার জমির ব্যবস্থাও করে দেয়।

এখন প্রশ্ন হলো, জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক তামাক জাতীয় জিনিসের উৎপাদন ব্যবহার এবং প্রচার-প্রসারে বামফ্রন্ট সরকার এবং সংগঠনগুলোর এত আগ্রহ

জনমত

কেন? রাজনীতিক মহল থেকে শোনা যায়, গরীব মানুষ না থাকলে গরীবের সরকার থাকে না। সাধারণ মানুষের চিন্তা এবং চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গরীব মানুষ ধীরে ধীরে দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করে। তাই, বামফ্রন্ট সরকার তার অস্তিত্ব অটুট রাখার জন্যই জনস্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর মদ্যপ সংস্কৃতির মতো ধূম্রলোচন সংস্কৃতির ও প্রচার প্রসার চায়। তাদের এই কাজের অগ্রগতির নিদর্শন হিসেবে এখন সারাদেশে বিড়ি শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষের উপরে বলে বামপন্থী তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন। যদি এই জনস্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর তামাক জাতীয় জিনিসের উৎপাদন এবং ব্যবহার সারাদেশে নিষিদ্ধ করা হয়, তা হলে এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য বিকল্প উপার্জনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু তা কি সম্ভব? কারণ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুখোশধারীদের গণআন্দোলন। আর সেই আন্দোলনে সামিল হবে তামাকাসক্ত স্বদেশী জনগণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি কোনও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সরকারের পক্ষে হাল ছেড়ে দেওয়া সমীচিন হবে? তাই জনসাধারণের প্রধান চিন্তার বিষয় হলো পশ্চিমবঙ্গে একটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা। যে সরকার আমাদের স্বদেশী চিন্তা ও চেতনার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হবে।

এমনই নানা রকম আলাপ-আলোচনা এখন সর্বত্রই শোনা যায়। এ ছাড়াও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলকাতার বামপন্থী ধূমপান সংস্কৃতির উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ব্যক্তিগণের একটা বড় অংশই এখন আর ধূমপান বিষয়ক বিধিনিষেধ মেনে চলেন না। কারণ, পুলিশ প্রশাসন নিজেই শাসক দলের কাণ্ডকারখানা দেখে হতাশায় ভুগছে। এর ফলে, প্রকাশ্যে ধূমপানের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ কার্যকর রাখতে তারা মোটেই আগ্রহী নয়। তাই দেখা যায়, থানার সঙ্গে লাগোয়া পান বিড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ধূমপায়ীগণ যথেচ্ছ ভাবে ধূমপান করে পরিবেশকে দূষিত করছে। তা ছাড়া এতদিন আমরা দেখেছি, "বাসে ধূমপান নিষেধ" কথাটি লেখা থাকতো। এখন কলকাতার নব্য ব্যবস্থায় নূতন বাসে আর ওসব কথা লেখা নেই। নূতন লোকাল ট্রেনের কামরাতেও অবস্থা একইরকম। ধূমপায়ীরা বাসে ট্রেনে তাই এই সুযোগটি এখন কাজে লাগাচ্ছে।

বাংলায় একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে— কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে; কিন্তু এমন কিছু লোক আছে, যারা দেখে বা ঠেকে কিছুতেই শেখে না। ধূমপায়ীদের মানসিকতা ও সেই প্রবাদ বাক্যটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি গণতান্ত্রিক দেশে কঠোর অনুশাসন দৃষ্টিকটু হলেও, জনস্বার্থে এর প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন বলেই মনে করেন অনেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক।

ধূমপান এবং মদ্যপানের ক্ষেত্রে সেই কঠোরতা প্রয়োগ করে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার যথেষ্ট সুফল লাভ করেছেন; কিন্তু ব্যতিক্রম আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মদ এবং ধূমপানের সামগ্রীর উৎপাদন ও উপভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে তারা এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। কারণ চিন্তা এবং চেতনার অবলুপ্তি ঘটিয়ে দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে না পারলে যে গরীবের সরকার থাকবে না। হবে না চীন রাশিয়ার মগজ ধোলাই করা স্বপ্ন পূরণ।

হিন্দু অর্থনীতির কিছু অনবদ্য পরম্পরা

রবীন সেনগুপ্ত

হিন্দুরা সুপ্রাচীন কাল থেকেই দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করার সাথে সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়েও বাণিজ্য করে এসেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে বরাবরই ভারতবর্ষের কিছু সাদৃশ্য আছে; আবার বৈসাদৃশ্যও রয়েছে বহু। ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ক্রিয়া-কর্মাদির প্রতি আগ্রহ চিরকালই অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। ফলতঃ ভারতবর্ষের অর্থনীতিও সেযুগের মতো এযুগেও দুই ধরনের খাতে প্রবাহিত হয়েছে। এক, বিশ্বের অন্যান্য দেশের চাহিদা রুচি মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাণিজ্য। দুই, দেশের অভ্যন্তরে একান্ত নিজস্ব কিছু বিষয় নিয়ে বাণিজ্য। তার সাথে দেশের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ের সাথে কম সম্পর্ক আছে এমন বিষয়ে বাণিজ্যও বরাবরই হয়ে আসছে অবশ্য।

ভারতবর্ষ যতখানি ধূপধূনার ব্যবহার করা হয় তা অপর কোনও দেশে হয় না। ধূপকাঠি প্রস্তুতকারক সংস্থা ও ধূপ বেচে আয় করে এমন মানুষের সংখ্যা এদেশে কম নয়। শুধু ধূপই নয়— গুগগুল, কর্পূর, হরিতকী, পৈতা, সিন্দুর, আলতা, কম্বলের আসন, চন্দন, অগুরু এই সব বস্তুর বিক্রয় ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশী হয়। অজস্র দেবদেবীর মূর্তি, চিত্রপট, শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা, রুদ্রাক্ষ, তুলসী ইত্যাদির মালা, আতপ চাল, সুপারী, পান, ঘট—এগুলির ক্রয় বিক্রয়ও হিন্দুরাই মূলতঃ করে থাকে। অনাদি কাল থেকে অদ্যাবধি এগুলি থেকে কত মানুষ যে আয় করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এগুলি সবই আধ্যাত্মিক-বিষয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত অর্থনীতির মধ্যে পড়ছে। মশলা, সুগন্ধী, দামী বস্ত্র এগুলি এদেশে বিদেশে সমান ভাবেই বেচাকেনা যায়। উপাসনালয় নির্মাণকে কেন্দ্র করে একটা অর্থনৈতিক চক্র সবদেশেই রয়েছে। কিন্তু এদেশে তার কালচার বা চর্চা আরও বেশী। বছরের মধ্যে দুর্গা পুজো, কালী পুজো, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, শীতলা দেবী, বীর হনুমান, বিশ্বকর্মা, মনসা দেবী, শিব ও কৃষ্ণ পুজো— এই ১২টি দেবদেবীর পূজা নানা স্থানে কম বেশী হয়েই থাকে। এছাড়াও রয়েছে হরিনাম সংকীর্তনের ছোট বড় আসর, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, বিবাহ, দীক্ষাগ্রহণের আসর, বিভিন্ন গুরুদেবদের পূজন, অমাবস্যা-পূর্ণিমায়, গ্রহণে ও অন্যান্য তিথিতে বিশেষ যজ্ঞ ও পূজনের ব্যবস্থা। এইগুলির জন্য হিন্দুদের অর্থনীতি সচল থাকে। এগুলির মাধ্যমে হিন্দুদের অনেকেই যাহোক করে মোটা ভাত কাপড়ের একটা ব্যবস্থা সেই অনাদি কাল থেকে করে আসছেন, ফলে কখন জেহাদ করব, কি করে কাফের মারব, কত তাড়াতাড়ি মারা গিয়ে বেহস্তে হুরীদের নিয়ে স্ফূর্তি করতে পারব— এ চিন্তা হিন্দুদের মনে বড় একটা আসে না। যারা বলেন যে পুরোহিত শ্রেণীর নিজেদের আয়ের কথা ভেবে পূজা-অর্চনাগুলি সৃষ্টি করেছেন তারা ভুল বলেন। কারণ বরাবরই একটা পূজা থেকে পুরোহিতরা যা আয় করেন, পূজার দ্রব্যগুলি সরবরাহ করে, অন্যান্য পেশার ব্যক্তিরা তার থেকে অনেক বেশী আর করেন। তার সাথে সারা বছর পূজা অর্চনার ব্যবস্থা থাকায় মানসিক তৃপ্তি, সুস্থ চিন্তাধারা এগুলির একটা সুবিধা তো সমাজে পেয়েই আসছে। বর্তমানে একটা দুর্গাপূজা থেকে পুরোহিত যদি ১৫০০ টাকা পেয়ে থাকেন, তাহলে ঢাকি পায় ৩০০০ টাকা। পুরোহিত ও ঢাকি উভয়েরই অ্যাসিস্টান্ট থাকে। তারাও এর থেকে কিছু পায়। আলোক সজ্জা ও প্যান্ডেলের কাজ যারা করেন তারাও অল্প আয়ের মানুষ। তারাও বরাবার পূজার কারণে কিছু আয়ের সুযোগ পান। ডেকারেটারের মালিকের আয়টা অবশ্য ভালই হয়। প্রতিমা নির্মাণেও ভাল খরচ আছে। প্রতিমা শিল্পীরাও খুব একটা স্বচ্ছল ঘরের হন না। তারাও হিন্দুদের মূর্তিপূজা কেন্দ্রিক অর্থনীতির জন্য সারা বছর কর্মের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ পান। প্রতিমার দেহের রং, চুল, মুকুট, অস্ত্র

সরবরাহকারীরাও কিছু আয়ের মুখ দেখতে পান— এই সূত্র ধরেই। প্রতিমা বহনকারী ভ্যানওয়ালারা, পুজোর প্রচার পত্র ছাপানো প্রেসওয়ালারা, ঠাকুরের ভোগরন্ধনকারী পাচকরা, পূজা উপলক্ষে সাহিত্য প্রকাশকারী লেখকরা, প্রকাশকরা, গানের বাজনদার শিল্পীরা এরা প্রত্যেকেই কমবেশী আয় করতে পারেন পূজাগুলিকে কেন্দ্র করে। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা, বস্ত্র নির্মাতারা, পর্যটন ব্যবসার জন্য ক্রয় করা বাসের মালিক ও ড্রাইভারেরা, হোটেল, রেষ্টুরেন্টের ব্যবসায়ীরাও এই উপলক্ষে বিশেষ লাভের মুখ দেখতে পান। আতস-বাজি নির্মাতাদেরও এই লাভবানদের দলে অনায়াসেই ফেলা চলে। পূজা উপলক্ষে কোটি কোটি টাকা এমনি নষ্ট হয় না। বরঞ্চ তা মানুষের মধ্যেই নানান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর বদলে সেই অর্থ যদি এমনই গরীবদের দান করে দেওয়া যেত তাহলে খেটে খাওয়ার সংস্কৃতিটা তারা হারিয়ে ফেলতেন। তাই কাজের মাধ্যমেই অর্থগুলি সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করার ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুরা করে আসছে। সারা হিন্দুস্থান জুড়ে হিন্দু সাধক ও দেবদেবীরা যে সব তীর্থস্থান সৃষ্টি করেছেন অদ্যাবধি, হিন্দু রাজারা যেসব বিশাল মন্দির নির্মাণ করে গেছেন এবং সেগুলি দর্শনের জন্য দশনার্থীদের আগমন অবস্থান এবং প্রতিগমনকে কেন্দ্র করে যে অর্থনীতি অনাদি কাল থেকে চলে আসছে সে ব্যাপারেও অন্যান্য দেশের চেয়ে আমরা বরাবরই এগিয়ে। একটা ভাটিকান সিটি বা একটা কাবাগৃহ দেখতে অনেকে আসতে পারেন কিন্তু হিন্দুদের মথুরা-বারাণসী-অযোধ্যা, দ্বারকা, কামাখ্যা, পুরী, তিরুপতি, পুষ্কর, অমরনাথ, কৈলাস, মীনাক্ষী, হরিদ্বার, মাদুরাই, দেওঘর, নবদ্বীপ-মায়াপুর এগুলির সম্মিলিত জনসমাগম আরও অনেক বেশী। তারও পরে রয়েছে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, দেবীর একান্ন পীঠের জনসমাবেশ ঘিরে দীর্ঘদিনের অর্থনীতির সচলতা। মন্দির মঠ আশ্রমগুলির সেবাইত, পুরোহিত, বাবাজী, আশ্রিত অনাথ ও অন্যান্য ভক্তদের সংখ্যা আমাদের যা রয়েছে তাই দিয়েই একটা দেশ তৈরি করা যায় যার জনসংখ্যা সুইজারল্যান্ড বা ইজরায়েলের চেয়ে অধিক হয়ে যেতে পারে। এসবই আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক হিন্দুর স্পেশাল সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক রূপরেখা। মঠ-আশ্রম এদেশে এতনা থাকলে মঠাশ্রিতদের অনেকেই পেশার অভাবে গুন্ডা-বদমাইস নেশাখোর হয়ে যেতে পারত। বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই এরা সুস্থ জীবনে রয়েছে। তাই ধর্ম বিশ্বাসে কিছু ভ্রম থাকলেও তা অবশ্যই সমাজের পক্ষে উপকারী।

এরপর রয়েছে হিন্দুদের জ্যোতিষে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে কত মানুষ যে আয় করেন তার ইয়ত্তা নাই। প্রবাল, চুনী, মুক্তা, গোমেদ প্রভৃতি রত্নের ক্রয়বিক্রয়ের পিছনে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয় মুখ্যত জ্যোতিষ ভিত্তিক অর্থনীতির জন্যই। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চান জ্যোতিষবিদ্যা উঠে যাক। তাহলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কি জ্যোতিষ অর্থনীতির সাথে যুক্ত এতগুলি মানুষকে বিকল্প পেশার সন্ধান দিতে পারবেন? কমিউনিস্ট ও সেকুলাররা চান প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম উঠে যাক। শুধু মানবধর্ম থাকুক। তারা কি পারবেন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অজস্র মঠবাসীদের অন্ন বস্ত্রের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে? ফল এবং মিষ্টান্নকে কেন্দ্র করেও হিন্দুদের একটা ভাল অর্থনৈতিক পরম্পরা প্রচলিত আছে সেই অনাদিকাল থেকে। ফলের ব্যবসা অন্যান্য দেশেও রয়েছে। তবে তারা পূজাতে ফল ব্যবহার করে না। যেটা হিন্দুরা করে থাকে। আর মিষ্টান্নের ব্যবসাটা এদেশেই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত।

প্রাচীন হিন্দু সমাজের রাজরাজাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে পাওয়া যায়। এই রাজকর্তব্যগুলিকে কেন্দ্র করেও হিন্দু অর্থনীতির একটা অংশ পরিচালিত হোত। রাজাদের নিয়মিত যুদ্ধ করে খেতে হোত। নিয়মিত কর আদায়, সৈন্য, সেনাপতি, গুপ্তচর, প্রহরী ইত্যাদি নিয়োগ করতে হোত। নৃত্যশিল্পী, চিত্রকর, গায়ক, বাদক জ্যোতিষী, পুরোহিত এদের একটা অংশকে রাজা ও জমিদাররা নিয়মিত অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য করে যেতেন। যুদ্ধ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যে ব্যবহার করার জন্য রাজাদের প্রচুর হাতি, ঘোড়া, রথ, তরোয়াল, বর্শা, শিরস্ত্রাণ, গদা, ঢাল, সড়কি, রাজপোষাক, রাজকীয় ছত্র, পাদুকা, সিংহাসন রত্ন, ধাতু ইত্যাদি কিনতে হোত। ফলে এইসব বিষয়ের ব্যবসায়ীরা লাভের মুখ দেখতে পেতেন নিয়মিত। কারারক্ষী, হিসাবরক্ষী, সাজসজ্জায় পটু ব্যক্তিরাও রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। এইগুলি অন্যান্য দেশেও কম বেশী ছিল। তবে বিবাহ, যজ্ঞ, শিকার উৎসব, নৃত্যগীত অনুষ্ঠান— এসবের পিছনে হিন্দুরা যে জাঁকজমক আচরণ করে থাকে, এতটা অন্যদেশে ছিল না। এখনও এই আধুনিক যুগে সেই প্রাচীন অর্থনীতির পরম্পরা ধরে হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশ জীবিকা নির্বাহ করছে ও ভবিষ্যতেও করবে। কম্পিউটার, এরোপ্লেন, চলচ্চিত্র— এইসব নতুন সৃষ্ট বিষয়ের উপর যে অর্থনীতি অধুনা চলছে তার প্রচারের ঝলকানিতে সাবেকি হিন্দু অর্থনীতির অনেক কিছুই ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু সেগুলির অস্তিত্ব আছে। বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে সেই সাবেক ধারার অর্থনীতি, আধুনিকতার সাথে এমন ভাবে মিশে গেছে যে সহসা সেগুলিকে প্রাচীন পরম্পরার বিষয় হিসাবে চিনতে পারা যায় না। তবে খাতা কলম নিয়ে চুলচেরা হিসাব নিকেষ করতে বসলে অনেক কিছুই অনুভব করতে পারা যায়।

ষোড়শ মহাজনপদ

বৃজি বা বজ্জি

গোপাল চক্রবর্তী

রিস ডেভিডস এবং কানিংহামের মতানুসারে আটটি মৈত্রীবদ্ধ গোষ্ঠী (আঠ্‌ঠ কুল) বৃজির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বৃজি, বিদেহ, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক, শাক্য প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া অন্যান্য রাজ্যগুলি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এই আটটি রাজ্যই ছিল স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র। বৃজি বা বজ্জি ছিল প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে প্রধান। এই মিত্রসঙ্ঘের নামও ছিল বৃজি বা বজ্জি। বৃজির অন্তর্গত শাক্য কুলে ভগবান বুদ্ধ এবং জ্ঞাতৃককুলে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। নেপালের তরাই অঞ্চলে ছিল শাক্যদের রাজ্য এবং বৈশালীর উপকণ্ঠে কুণ্ডপুর ও কোল্লগ জ্ঞাতৃকগণের বাসভূমি ছিল। নেপাল সীমান্তে অবস্থিত মিথিলা ছিল বিদেহ রাজ্যের রাজধানী। রামায়ণে বিদেহ এবং মিথিলার কথা বারবার এসেছে। রাজর্ষি জনক ছিলেন মিথিলার রাজা। তাঁর বিখ্যাত হরধনু ভঙ্গ করে শ্রীরামচন্দ্র জনকের কন্যা সীতাকে বিবাহ করেছিলেন।

লিচ্ছবিদের রাজধানী ছিল মজফঃরপুর জেলার অন্তর্গত বৈশালী বা বেসার। লিচ্ছবিরা ছিল এক পরাক্রান্ত জাতি। প্রাচীন ভারতের অনেক রাজা লিচ্ছবিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন। এক সময়ে অনেক ঐতিহাসিক লিচ্ছবিদের বহিরাগত মনে করতেন। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে লিচ্ছবিরা তিববতীয়। ডঃ সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে পারসিক। তবে এই মতবাদগুলি এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়।

ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এই বিষয়ে একমত যে লিচ্ছবিগণ ভারতীয় ক্ষত্রিয়। মহাপরিনির্বাণ সূত্তে আছে যে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর লিচ্ছবিরা মল্লদের কাছে দূত পাঠিয়ে বলেছিলেন যে গৌতমবুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তাঁরাও তাই।

লিচ্ছবিদের মতো বৃজিদের নামও বৈশালী নগরীর সঙ্গে জড়িত। পরবর্তীকালে বৈশালী শুধু লিচ্ছবি বা বৃজিদের নয়, মিলিত অষ্টকুলের রাজধানী ও প্রধান নগর রূপে গুরুত্ব লাভ করে। একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে বিদেহ রাজবংশের পতনের পর বৃজি মিত্রসঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রাজনৈতিক বিবর্তনের দিক থেকে প্রাচীন ভারত এবং গ্রীস দেশের মধ্যে সাদৃশ্যের উল্লেখ রয়েছে নানাস্থানে। ভারতের মতো গ্রীসেও হোমারিয় যুগে রাজতন্ত্রের পতনের পর অভিজাত প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল।

মগধের সঙ্গে লিচ্ছবিদের দ্বন্দ্বকে উপলক্ষ করে বৃজি প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রগুলি মগধের বিরুদ্ধে লিচ্ছবির পক্ষে যোগ দেয়। সুদীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে প্রজাতন্ত্রগুলির অর্থনৈতিক ও সামরিক অবক্ষয় ঘটে। ফলে এই প্রজাতন্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

বছর ঘুরে নারীর মূল্যায়ণ

ইন্দিরা রায়

দেখতে দেখতে একটা বছর অর্থাৎ বারোটা মাস পেরিয়ে এলাম আমরা। জীবনে প্রতিদিন আমরা যে সব কাজকর্ম করি;তার খতিয়ান করতে বসি শেষ বেলায় অর্থাৎ জীবনের শেষ লগ্নে। ঠিক তেমনিভাবেই একটা বছরে সমাজ সংসার রাজনীতি-শিক্ষা সর্বস্তরেই যা ঘটে;তার একটা মূল্যায়ন করা হয় বছরের শেষে।

আমরা নারী, স্বভাবতই নারী তার জায়গায় কতখানি সার্থক হলো তার মূল্যায়নে চোখ রাখি। কিন্তু হতাশার ছবিটাই ফুটে ওঠে। যখনই দেখা যায় চিরাচরিত কাল ধরে যে অবনমন, তা আজও একই ধারায় একইভাবে চলে আসছে। পুরাকাল থেকে আজ এই একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও মহিলারা পদে পদে হিংসার শিকার। হ্যাঁ, একইভাবে তার প্রকাশ হয়ত ঘটে না, বদলে যায় তার ধরণ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কখনও যৌন, কখনও মানসিক কখনও বা শারীরিক। ভালবাসার ভান ক'রে মিথ্যার কুহকে নারীর সর্বনাশেই পুরুষদের পরাক্রম। ধর্ষণ, যৌন হেনস্থা, অবমাননা, অবমূল্যায়ন প্রতি পদে পদে হয়ে চলেছে। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত

সমাজে। সময়ে সময়ে নারী সোচ্চার হচ্ছে, প্রতিবাদ করছে, সংগঠন করে আন্দোলন করছে— কিন্তু নীটফল শূন্য। তবে একথা বলাও ঠিক নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে নির্যাতিত মহিলারা অভাবের সংসারে স্বামীর মদ্যপানের অত্যাচার থেকে সংসার ও সন্তানদের বাঁচাতে নিজেরাই এগিয়ে এসে মদের ঠেকগুলোকে ভেঙে ফেলে স্বামীদের জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে। আবার, অল্প শিক্ষিত গৃহবধূরাও কোনও পুরুষের অশালীন আচরণ বা যৌনতার আবেদনের বিরুদ্ধে কারোর সাহায্য না নিয়েও সেই পুরুষকে চরম শাস্তি দিতে সক্ষম হচ্ছে। অর্থাৎ মহিলারা বলতে শিখছে— আর নয়, এবার আমরা রুখে দাঁড়াব।

তবে হ্যাঁ, বর্তমানে সরকারও নারীদের এত নানা ধরনের অত্যাচারের জন্য নারী পাচার বিরোধী আইন, কন্যা ভ্রূণ হত্যা বিরোধী আইন, বিবাহ আইন আসছে, তবে কার্যক্ষেত্রে তা কতটা বলবৎ হচ্ছে সেটা বলা সম্ভব নয়। সত্যিই কিন্তু মেয়েরা নিজেদের জায়গা করে নিতে আজ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কিছু কিশোরী ছাত্রী তাদের বাবা-মার নির্দিষ্ট করা বিবাহ রুখে দিয়ে

শিক্ষিত হয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সোচ্চার হয়েছে। বিশেষত যে তিনজন এই কাজে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, তারা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তাঁর হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে সমাজে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শিক্ষাজগতে মেয়েরা লড়াই ক'রে পুরুষের তুলনায় শীর্ষস্থান অধিকার করছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে— কি প্রশাসন, কি বিচার-ব্যবস্থা, পুলিশি-ব্যবস্থা, বিমান পরিষেবা, চিকিৎসা পরিষেবা, খেলাধূলা সর্বত্রই মহিলারা সম্মানজনক পদ লাভ ক'রে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষেই আজ নারীর জাগরণ ঘটছে।

সবচেয়ে উল্লেখজনক এ বছর খেলাধূলায় মেয়েদের সাফল্য। এশিয়াড, কমনওয়েলথ্ গেমসে মেয়েদের জয়জয়কার। অথচ, বেশির ভাগই সাধারণ ঘরের মেয়ে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে চোখ রেখে সকলেই জেনে গেছেন বিভিন্ন দেশের মেয়েদের জয়ের খবর। বিশেষত বাঙালি হিসেবে বাঙালি মেয়েদের সাফল্য আমাদের গর্বিত করে।

এভাবেই মহিলারা লড়াকু মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাবে। পদে পদে বাধা পেলেও থেমে থাকার পাত্রী তাঁরা নন। এতেই ঘটবে নারীর জয়। চিরকালই প্রতিযোগিতা থাকবে এবং এর জন্যই মনোবলও বাড়বে মেয়েদের মধ্যে। আগামী বছরের জন্য শুভ কামনা— মেয়েরা হয়ে উঠুক জাতির মেরুদণ্ড। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে ভারতীয় মেয়েদের সামাজিক অবস্থান বদলের চিত্র। লক্ষ্য পূরণের জন্য ৮০ শতাংশ পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত ভারতীয় মেয়েরা। ১৮-২৩ বছর বয়সী মাত্র ১০ শতাংশ উচ্চশিক্ষা নিতে পারেন।

আধুনিকতা ও শিক্ষার আলোকে মেয়েদের বিরুদ্ধে অন্যায় অবিচার রুখতে 'ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইম্যান' শীর্ষক আলোচনা নানা জায়গায় হচ্ছে। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের সুচিন্তিত অভিমতও দিচ্ছেন। কিন্তু তেমন কোনও সুফল বা সমাধানের সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং সেমিনার না ক'রে পথে নামুন, অত্যাচারীতের পাশে দাঁড়ান ও যথাযথ অ্যাকশন গ্রহণ করুন। নারী তার নিজস্ব সত্তা যেন বজায় রেখে সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে পারে আর তবেই হবে দেশ ও সমাজের উন্নতি। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়— যে দেশে নারীর সম্মান নেই;সে দেশের উন্নতি নেই।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ১৮

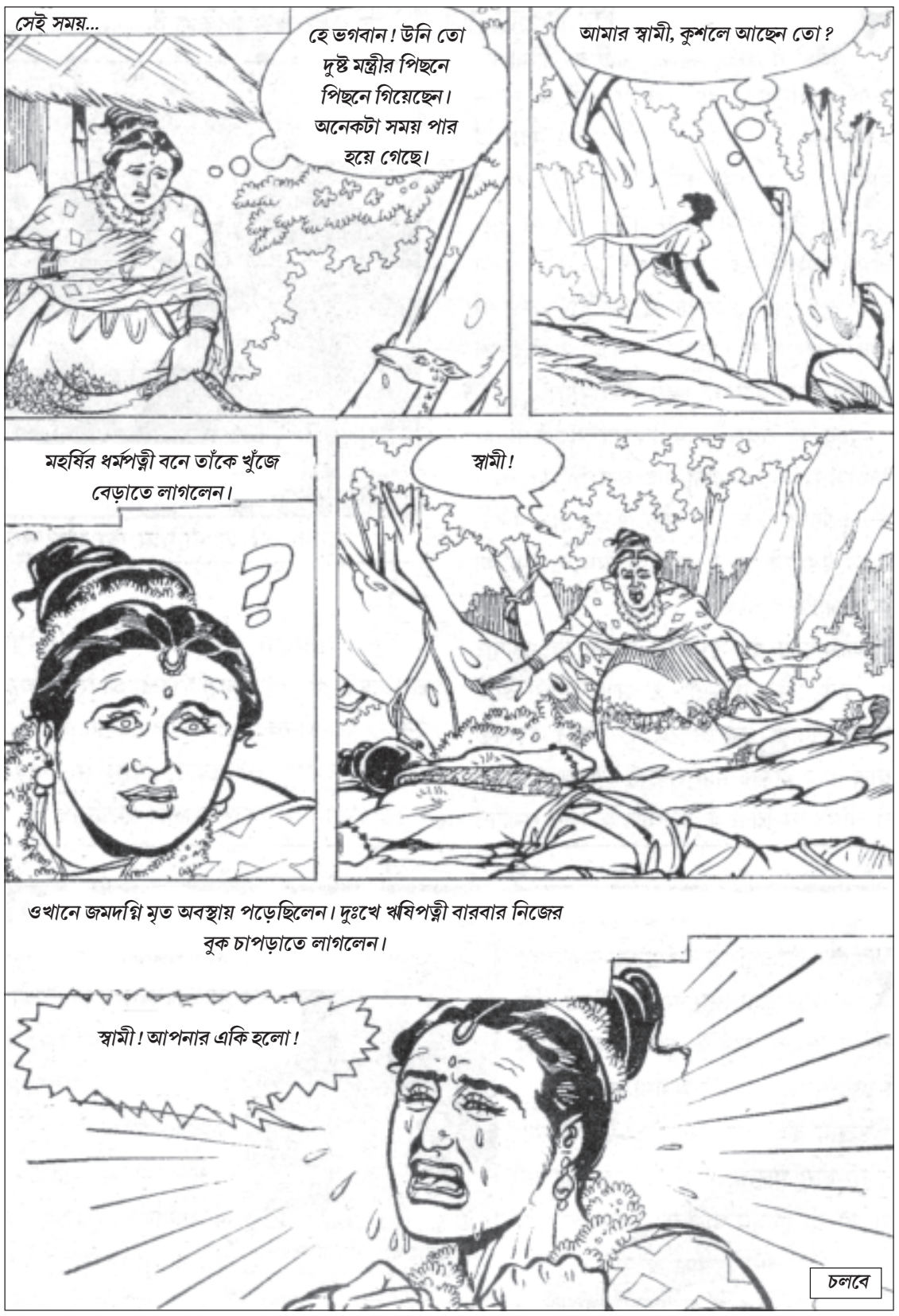

রাজ্যজুড়ে আয়োজিত হিন্দু সম্মেলনের কার্যক্রম

কলকাতায় হিন্দু সম্মেলন

বাবরি মসজিদ কথাটাই ভ্রান্ত

রামজন্মভূমিতে রামমন্দির নির্মাণ, কাশ্মীর ভারতের অখণ্ড সত্ত্বা —এই দুই দাবীতে এবং সঙ্ঘের বিরুদ্ধে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপবাদের প্রতিবাদে সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেরও বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে হনুমৎ শক্তি জাগরণের মাধ্যমে হিন্দু সম্মেলন। তারই টুকরো ঝলক এবারের স্বস্তিকা'র পাতায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাবরি মসজিদ কথাটা যে একেবারে ভ্রান্ত তা গত ৩০ নভেম্বর ২০১০-এ এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ -এর রায়ে-এ প্রমাণ হয়ে গেছে। একই সঙ্গে রায় জন্মস্থানে রামমন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত হয়েছে বলে দাবি করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সমিতির সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী। গত ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা গোয়াবাগান সি আই টি পার্কে অনুষ্ঠিত হনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হিন্দু সম্মেলন ও মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে এসে তিনি এই মন্তব্য করেন।

বক্তব্য রাখছেন সুনীলপদ গোস্বামী। ছবি ঃ শিবু ঘোষ

শ্রী গোস্বামী আরও বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ পাড়ায় পাড়ায় মহাবীরের পূজা করার কথা বলতেন। সেই মহাবীর হলো পবনপুত্র হনুমান। যার দাপটে রাবণ ও তাঁর লঙ্কা ছারখার হয়েছিল। হিন্দু সমাজের মধ্যে সেই ভাব জাগানোর জন্যই হনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতি দেশব্যাপী এই ধরনের কর্মসূচী পালন করছে। যার মধ্যে যজ্ঞ, শ্রীহনুমান পূজা, হনুমান চল্লিশা পাঠ ইত্যাদি। এর মাধ্যমে হিন্দু সমাজের মধ্যে যে সকল বিভ্রান্তি একদল দুষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও তাদের দল এবং প্রচার মাধ্যম দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছে তার অবসান ঘটবেই। আদালতের রায় যে ভ্রান্তির নিরসন করছে তা সামাজিক একাত্মতার প্রভাবে দূর হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মঙ্গলচারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের সাধু-সন্ত ও মহাত্মাগণ প্রবচন ও আশীর্বচন প্রদান করেন। ভৈরবগিরি মহারাজ বীর হনুমানকে ক্ষাত্র শক্তির প্রতীক বলে বর্ণনা করেন। তিনি হিন্দু তীর্থ ক্ষেত্রগুলিতে বিধর্মীদের আক্রমণের ঘটনা উল্লেখ করার পাশাপাশি কাশী, মথুরাসহ দেশের একাধিক স্থানে মন্দিরের উপর হাজার মসজিদ নির্মাণের প্রয়াস তুলে ধরে বলেন, এগুলো সনাতন সংস্কৃতির উপর বিজাতীয় শক্তির আক্রমণের নিদর্শন। রামমন্দিরের মতো এগুলোর প্রতি নতুন করে ভাববার সময় এসেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সকলে সাড়ে এগারোটা নাগাদ আর্য সমাজের সহায়তায় বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বহু পরিবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে যজ্ঞে আহুতি দিতে এগিয়ে আসেন।

সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর শারীরিক প্রমুখ বিভাস মজুমদার এবং কলকাতা মধ্যভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ চঞ্চল জানা স্বাধীনত্তোর ভারতে কংগ্রেস তথা গান্ধী পরিবার কিভাবে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তা বর্ণনা করেন। কংগ্রেস কর্তৃক প্রচারিত 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি আখেরে কংগ্রেসের পতনের কারণ হবে বলে তাঁরা মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ১৬নং ওয়ার্ডের জনপ্রিয় কাউন্সিলর শ্রীমতি শুক্লা ভৌড় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানান। শেষে সর্বসম্মতিক্রমে রামমন্দির নির্মাণের ব্যাপারে উপস্থিত প্রায় দু'হাজার ভক্ত সংকল্প গ্রহণ করেন।

তেঘড়িয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ১৯ ডিসেম্বর হনুমৎ শক্তি জাগরণের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হলো তেঘড়িয়ার লোকনাথ মন্দিরের সন্নিকটস্থ মাঠে। আর এস এসের কলকাতা উত্তর-পূর্ব ভাগের স্বয়ংসেবক সহ বিবিধ ক্ষেত্রের প্রায় আটশ' কার্যকর্তা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সংস্কার ভারতী

বক্তব্য রাখছেন জয়ন্ত পাল।

পরিবেশিত ভক্তিগীতি এই অনুষ্ঠানের আমেজকে প্রথম থেকেই চড়া সুরে বেঁধে দিয়েছিল। কার্যক্রমের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হিসেবে যজ্ঞানুষ্ঠান ও হনুমান চালিশা পাঠ নিঃসন্দেহে আগাগোড়া অনুষ্ঠানটিকে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল। মহানামব্রত মঠের বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী তাঁর স্বাগত ভাষণে স্বয়ংসেবক থেকে শুরু করে এলাকাবাসী সকলকেই আপন করে নেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেঘড়িয়া গোরক্ষনাথ মঠের প্রধান যোগী শিবনাথ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক দিলীপ ঘোষ, আর এস এসের কলকাতা মহানগর কার্যবাহ জয়ন্ত পাল, সহ-কার্যবাহ শ্রীমন্ত চন্দ, পূর্ব-কলকাতা বিভাগ কার্যবাহ বিশ্বনাথ নন্দী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কলকাতা মহানগরের সংগঠন সম্পাদক অনুপ মণ্ডল, প্রান্ত কার্যকারিণী সদস্য মনোজ জয়সোয়াল, পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রদেশ কর্মসমিতির সদস্য বিশ্বনাথ বিশ্বাস, বিধাননগরের বঙ্গভাষী সমিতির আহ্বায়ক প্রভাকর মণ্ডল, ধর্মজাগরণ মঞ্চের আহ্বায়ক শিউনারায়ণজী প্রমুখ।

কাশীনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১১ ডিসেম্বর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার রায়দীঘি ব্লকের কাশীনগরে হনুমৎ শক্তি জাগরণ মহাযজ্ঞ ও হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে সমবেত গীতা পাঠ, বৈদিক শান্তি যজ্ঞ, ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন সর্বেশ্বরানন্দ মহারাজ। তিনি শাসক

কাশীনগরে বক্তব্য রাখছেন স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ মহারাজ।

দলের 'হিন্দু সন্ত্রাস' অভিধা প্রয়োগের তীব্র বিরোধিতা করেন। এছাড়াও অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস। তিনি আদালতের রায় মেনে সব পক্ষকেই শ্রীরামমন্দির নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান জানান। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী উত্তমানন্দ, স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ, সোমরাবাজার মঠের স্বামী উত্তমানন্দ মহারাজ প্রমুখ। ২৮ জন পুরোহিত একত্রে ধার্মিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সভাপতিত্ব করেন চাপলা হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক পালান চন্দ্র হালদার।

কালিয়াগঞ্জে হিন্দু সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'এদেশের আত্মপরিচয় হলো হিন্দু, হিন্দুত্ব। শাসকশ্রেণী বারবার তা ভুলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস করেছে। এখনও তা চলছে। আমরা হিন্দুরা হাজার বছর যাবৎ লড়াই করেছি। কখনও হারিনি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে আমরা হেরে গিয়েছিলাম। আমরা যদি সকলেই কাজে লাগি, নিজের নিজের ক্ষেত্রে অভেদ্য দুর্গ তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা এই দেহে এই চোখে ভারতবর্ষকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ এবং ঐশ্বর্যশালিনী ভারতমাতাকে দেখে যেতে পারবো।' উপরের কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার। তিনি গত ১৯ ডিসেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার

কালিয়াগঞ্জে হিন্দু সম্মেলনে আগত জনসাধারণ। ইনসেটে বক্তা সত্যনারায়ণ

কালিয়াগঞ্জে স্থানীয় শ্রীহনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এক বিরাট হিন্দু সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন। কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে কালিয়াগঞ্জ শহর এবং ব্লকের শতাধিক গ্রাম থেকে কয়েক হাজার আবালবৃদ্ধ বণিতা সকাল থেকে একত্রিত হয়েছিলেন। অনেকে শোভাযাত্রা সহকারে মাঠে প্রবেশ করেন।

এদিন সকাল থেকে মহাবীর হনুমানের পূজা-পাঠ আরম্ভ হয়। কয়েকজন পুরোহিত একাজে নিযুক্ত ছিলেন। বেলা সাড়ে বারোটায় ধর্মসভা আরম্ভ হয়। বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা' পত্রিকার সহ-সম্পাদক বাসুদেব পাল, সীমা জনকল্যাণ সমিতির উত্তরবঙ্গের সংযোজক মটুকেশ্বর পাল এবং সিহল থেকে আগত স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দ অবধূত। সভার পর হয় বৈদিক বিশ্বশান্তি যজ্ঞ ও প্রসাদ বিতরণ। যজ্ঞ পরিচালনা করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উৎপল মহারাজ। সকলে শ্রীরামমন্দির নির্মাণকল্পে সংকল্পবাক্য পাঠ করেন। শুরুতে বোনেরা শ্রীহনুমান চালিশা গান পরিবেশন করেন। সভা পরিচালনা করেন বিশ্বরূপ কুণ্ডু এবং ধন্যবাদ জানান পীযূষকান্তি বসু।

কোচবিহার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ীতে শ্রী হনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতি দ্বারা আয়োজিত বিরাট হিন্দু সম্মেলন হাটখোলা রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সম্মুখে মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে তিলকধারণ ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরে রামকথা, ভারত গৌরব গাথা নিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয় হাজার লোকের উপস্থিতিতে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা সহ-সম্পাদক প্রদীপ থাপা, সমিতির সংযোজক তপন দেব, বিশিষ্ট আইনজীবী সুনীল দাস প্রমুখ। শ্রী গোস্বামী তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, সংগঠিত ও বিজয়ী হিন্দু সমাজই জগতকে শান্তি প্রদান করতে পারে। সেই জন্য শ্রীহনুমৎ শক্তি জাগরণের এই মহাযজ্ঞে সমস্ত গ্রামে প্রতিনিধিত্ব করার সংকল্প নিয়ে একে সফল করার জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা একান্তভাবে প্রয়োজন।

দেশের ক্রীড়া-প্রশাসনিক কর্তাদের চরম অপেশাদারিত্ব

ব্রাসা-হাউটনকে রেখে দেওয়াই ভবিষ্যৎ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলার জগৎ

একজন পান মাসে সাত লাখ টাকা, অন্যজন পাঁচলাখ। তার সঙ্গে রয়েছে সুসজ্জিত ফ্ল্যাট, দামি এ সি গাড়ি চবিবশ ঘণ্টার জন্য। ব্যক্তিগত সচিব ও পরিচারক, তাদের পিছনেও মোটা অর্থ ব্যয় হয়। ভারতের জাতীয় ফুটবল ও হকি দলের দুই বিদেশী কোচ এমনই ভি আই পি মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধে ভোগ করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। প্রতিদানে তাদের অবদান, জিজ্ঞাসা করলে ঢাকার কুট্টিরাও হেসে ফেলবে— 'অমন কথা জিগাইস না কত্তা। ওরা যে মেহমান'। আসলে সাদা চামড়ার প্রতি অন্ধ আনুগত্য দাসত্ব ও পরাধীনতার নামান্তর। এর থেকে মুক্তি আসবে

হাউটন

ব্রাসা

কি করে!

হাউটন এদেশে এসেছেন চার বছরের ওপর। দিল্লির মাঠে পরপর তিন বছর (২০০৭, ২০০৮, ২০০৯), দু'বার নেহরু কাপ, একবার এ এফ সি চ্যালেঞ্জ কাপে ভারতের সাফল্যের প্রধান কান্ডারি হিসেবে নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে গেছেন। ফেডারেশন কর্তা থেকে মিডিয়া কাউকেই পাত্তা দেন না। ওই তিনটি টুর্নামেন্টে নিজেদের সমগোত্রীয় কিংবা সামান্য উন্নত কয়েকটি দেশকে হারিয়ে দেশবাসীকে কল্পনা ও স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন করে দিতে সমর্থ হয়েছেন সুচতুর হাউটন। বৃটিশরা নিজেদের খুব ভাল করে পরিবেশন করতে জানে। তাদের কূটনৈতিক ও ব্যবসায়িক বুদ্ধি এতটাই যে বাকি দুনিয়া তাদের অজান্তেই কুর্নিশ করে থাকে।

চার বছর আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে হাউটনকে এদেশে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাকি দুই বিদেশী কোচের তুলনায় তাকে বেশি মনপসন্দ হয়েছিল তৎকালীন ফেডারেশন সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির। বলা হয়েছিল হাউটনের হাতে পড়ে মৃতপ্রায় ভারতীয় ফুটবলের নবজন্ম হবে। ভারত এশিয়ার বড় শক্তি হয়ে উঠবে। ফলশ্রুতি সাফ গেমসে ভারতের পদস্খলন। এশিয়ান গেমস প্রি-অলিম্পিক বা প্রি-ওয়ার্ল্ডকাপে প্রাথমিক রাউণ্ডের গণ্ডি পেরোতে ব্যর্থ ভারতীয় ফুটবলাররা। নিজের দেশের মাঠে বিশেষ ব্যবস্থায় নেহরু কাপ, এ এফ সি চ্যালেঞ্জ কাপ জেতা এক ব্যাপার আর বিদেশে গিয়ে শক্তপোক্ত টিমের মোকাবিলা করে নিজেদের মেলে ধরা অন্য ব্যাপার। গত চার বছরে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির বিরুদ্ধে মাঠে নেমে কি হাল হয়েছে হাউটনের কোচিংপুষ্ট ভারতীয় দলের, তা আর না লেখাই সমীচীন।

একই অবস্থা স্পেন থেকে নিয়ে আসা হকি কোচ ব্রাসার। ২০০৮-এ বেজিং অলিম্পিয়াডে খেলার টিকিট পায়নি ভারত। তার দু'বছর আগে দোহা এশিয়াডে কোনও পদক পায়নি ভারতীয় হকি দল। এহেন অবিশ্বাস্য দুটি ঘটনা এতটাই নড়িয়ে দেয় দেশবাসীকে যে মিডিয়ার প্রবল চাপে শেষ পর্যন্ত ২০০৯-এ ব্রাসাকে কোচ করে নিয়ে আসা হয়। তার আগে অবশ্য রিক চালর্সওয়ার্থের মতো বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ চার্লসওয়ার্থের সঙ্গে এদেশের হকি কর্তাদের প্রায়শঃই বিরোধ লেগে যাচ্ছিল। চালর্সওয়ার্থ নিজে অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়— পরে কুশলী কোচ হয়েছিলেন। সে দেশে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটও খেলেছেন দীর্ঘদিন। পেশায় ডাক্তার।

সবমিলিয়ে এক বহুমুখী, বহুদর্শী চরিত্র। এহেন এক ব্যক্তিকে ভারতীয় হকির কোচ কাম টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পদে রেখে দিলে যে কর্মকর্তাদের নিজস্ব মৌরসি পাট্টা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

তাই নানা অছিলায় তাকে বিদায় করে আপাত শান্ত ব্রাসাকে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি নাকি স্পেনের অন্যতম তাত্ত্বিক কোচ, ম্যান ম্যানেজমেন্টে সুদক্ষ। ম্যান ম্যানেজমেন্টের নমুনা কিরকম— জাতীয় দলের অধিনায়ক রাজপাল সিং তার ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে দলের হয়ে না খেলার সিদ্ধান্ত নেন। বিশ্বকাপ হকির আগে দলের কতিপয় খেলোয়াড় তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে না খেলার হুমকি দিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসেন। কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়াডের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসরে প্রভোজ্যোৎ সিংহের মতো তারকা ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে বসেন। আর তার স্ট্রাটেজি যা কিনা দুর্বোধ্যের মতো মনে হয় দলের সব খেলোয়াড়ের। তার পরিকল্পনার কোনও বাস্তবসম্মত ভিত্তি নেই বলে খোলাখুলি স্বীকার করেছেন রাজপাল।

ব্রাসার কোচিংয়ে মাঝারি মানের টুর্নামেন্ট সুলতান আজলান শাহ টুর্নামেন্ট ছাড়া সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ ভারত। তার সমর্থকরা হয়ত বলবেন দিল্লি কমনওয়েলথ গেমসে ভারত ফাইনালে উঠেছিল। হ্যাঁ পাকিস্তান, ইংল্যান্ডের মতো দলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা অবশ্যই কৃতিত্বের কিন্তু ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮-০ গোলে বিধবস্ত হওয়ায় যাবতীয় গৌরব অস্তমিত হয়েছে অচিরেই। তেমনই একমাস পরে চীনের মাটিতে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে হারেরই বা কি ব্যাখ্যা দেবেন ব্রাসা ও তার গুণমুগ্ধরা? লণ্ডন অলিম্পিকে সরাসরি খেলার টার্গেট নিয়ে এশিয়াডে গেছিল ভারতীয় দল। সেই সুযোগ পেয়ে গেল চিরশত্রু পাকিস্তান, যাকে ভারতের হাতে হারতে হয়েছিল গ্রুপলিগে। শেষপর্যন্ত কোরিয়াকে হারিয়ে খেলায় ব্রোঞ্জ পদকটি হস্তগত হয়েছে ভারতীয়দের।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম দ্বারা পরিচালিত ১৭তম প্রাদেশিক একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (দক্ষিণবঙ্গ) গত ৩, ৪, ৫ ডিসেম্বর ২০১০, চৌবেড়িয়া দীনবন্ধু বিদ্যালয়ে (উত্তর ২৪ পরগণা) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসাবে যথাক্রমে উপস্থিত ছিলেন অশ্বিনী কুমার সরকার— প্রধান শিক্ষক, দীনবন্ধু বিদ্যালয়— জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত। তপন চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাণীপুর শরীর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর, সাংসদ এবং চেয়ারম্যান, তপঃ জাতি, উপজাতি, ও বি সি, ভারতীয় সংসদীয় কমিটি। এছাড়াও বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রামগোপাল গুপ্তা— পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। গোপাল শেঠ বিধায়ক, বনগ্রাম বিধান সভা। শ্রী নন্দী, কর্মাধ্যক্ষ, কর্মাধ্যক্ষ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তর, বনগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি। জীবেন রায়, ন্যাশনাল প্রাইজ হোল্ডার হার্ডেলস। সনৎ সরকার, ন্যাশনাল প্রাইজ হোল্ডার, অ্যাথলেটিকস্। রুমা রায়, প্রশিক্ষিকা, ভারতীয় খেল প্রাধিকরণ। রথীন দত্ত— সহঃসভাপতি পশ্চিমবঙ্গ তীরন্দাজ অ্যাসোসিয়েশন। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৩৪৬ জন প্রতিযোগী দক্ষিণবঙ্গের ১৩টি জেলা হতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ২১৭ জন পুরুষ ১২৯ জন মহিলা।

একলব্য ক্রীড়া অনুষ্ঠানে যোগদানকারী প্রতিযোগীরা।

(১) দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছে। (২) দীর্ঘলম্ফন, (৩) লৌহবল নিক্ষেপ, (৪) তীরন্দাজ, (৫) কবাডী। পশ্চিম মেদনীপুর জেলা প্রথম পুরস্কার ৯, দ্বিতীয় ৮, তৃতীয় ৭টি— মোট ২৪টি পুরস্কার পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। দ্বিতীয় পূর্ব পুরুলিয়া জেলা উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতা অক্টোবর মাসের ২০১০, প্রথম সপ্তাহ হতে ব্লক স্তরে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে জেলা স্তর অতিক্রম করে, প্রদেশ স্তরে আসে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন ডাঃ রামগোপাল গুপ্তা এবং সমাপ্তি উৎসবে ভাষণ দেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রাদেশিক সভাপতি রণজিৎ ভট্টাচার্য।

রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন জরুরী

এম ভি কামাথ

রাজনৈতিক দল, আমলা, আদালত এমনকী সেনাবাহিনী, মায় মিডিয়া পর্যন্ত আদর্শচ্যুত হয়ে দুর্নীতি পরায়ণ হয় তবে তো জাতির লজ্জায় সীমা থাকে না। এমনকী সরকারি সংস্থা যাদের হাতে তদন্তের ভার ন্যস্ত, তারাও তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে ক্রমাগত।

গত একমাস যাবৎ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটছে। বৈদ্যুতিন মিডিয়ায় দুর্নীতি নিয়ে বিভিন্ন দলের মুখপাত্ররা পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছেন। এতে দেশের কী হলো? দুর্ভাগ্য হলো সংবাদমাধ্যমে দেখানো হচ্ছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল এইসব কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিতে যুক্ত। মিডিয়া তাদের কাজ করছে এবং এতে যা সামনে আসছে তা হলো সমাজের প্রতিটি অংশই দুর্নীতিতে যুক্ত। একজন প্রাক্তন আইনমন্ত্রী তো ছ'জন শীর্ষ আদালতের বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন। বর্তমানে কলকাতা উচ্চ আদালতের এক বিচারপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সংসদে ইমপিচের প্রস্তাব আনার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। এই বিচারপতি হলেন সৌমিত্র সেন। মুম্বইয়ে আদর্শ সোসাইটির কেচ্ছায় জড়িয়ে পড়লেন সেনাবাহিনীর উচ্চ কর্তারা, আমলারা। এই মামলায় মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীকে তো শেষপর্যন্ত তাঁর কুর্সি খোয়াতে হলো। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি এখন তদন্ত সাপেক্ষ। টেলি-যোগাযোগমন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে বিলম্বিত পদত্যাগ দেখিয়ে দিলো দুর্নীতি আমাদের সমাজকে কীভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

সময় হয়েছে যখন আমাদের দেশের বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে পরিচ্ছন্ন করার এবং দেশের প্রতিটি নেতার কাছে এই বার্তা পাঠানো যে, সে যে কোনও কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রীই হোক বা সে কোনও আমলাই হোক তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলেই তাকে চড়ামূল্যে তা মেটাতে হবে।

এইসব গোলমাল শুরু হয়েছে আর্থিক উদারীকরণের সঙ্গে। বাণিজ্য উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গেই উন্মুক্ত হলো দুর্নীতির রুদ্ধ দুয়ার। এই দুই প্রক্রিয়াই একসঙ্গে যাত্রা শুরু করলো। মামলা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রতন টাটার অভিযোগ যে, কোনও এক মন্ত্রী তাঁর কাছে উৎকোচ হিসেবে ১৫ কোটি টাকা চেয়েছে তাঁকে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে তাঁর সংস্থার অংশীদারিত্ব পাইয়ে দেবার শর্তে।

কোনও কিছু লাভ করতে গেলে যে টু-পাইস দিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বা দপ্তরের কর্তার হাত তৈলাক্ত করতে হয় তা এখন দিবালোকের মতো সাদা। সমাজে পচন ধরেছে। নইলে এক প্রাক্তন মেডিকেল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান একটন সোনা নয়ছয় করতে পারে! তার কাছ থেকে কি সেই একটন সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে? ওই ব্যক্তিকে কি আদালতে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা শোনানো হয়েছে? এব্যাপারে সবাই চুপচাপ। সত্য হলো অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই রাজনীতির আঙিনায় চোখ বুঁজে রয়েছে। বিশ্বাসযোগ্যতা আজ এক ক্ষয়িষ্ণু সামগ্রী।

এর স্পষ্ট কারণ হলো, রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের আদর্শচ্যুত হয়েছে। বাইবেল বলেছে যে, যার আদর্শ নেই, দর্শন নেই তার অবধারিতভাবে বিনাশ হবে। কিছু কিছু কর্পোরেট জগতের ব্যক্তিরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুক্ত হস্তে রাজনেতাদের উৎকোচ বিলিয়ে যায়। দেশ টাটার কাছে কৃতজ্ঞ যে টাটাদের মধ্যে এখনও সেই মূল্যবোধ বেঁচে রয়েছে।

যখন আদর্শের মৃত্যু হয়, তখন আদর্শকে সরিয়ে ক্ষুধা অর্থাৎ লোভ দেশকে আক্রমণ করে এবং উৎকোচ গ্রহণকারীরা রাতারাতি ধনী হয়ে যায়। কথায় বলে ক্ষমতাই দুর্নীতির উৎসমুখ এবং একচ্ছত্র ক্ষমতাই একচ্ছত্র দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়। আজ আমরা অসহায়ভাবে তা লক্ষ্য করছি।

ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে নীতি বিসর্জন দিতে হচ্ছে। কোয়ালিশন সরকারের প্রতিটি অংশগ্রহণকারী দল চাইছে দপ্তরের একচ্ছত্র আধিপত্য যাতে সেই দল বা দলের মন্ত্রী নিজের খুশীমতো প্রশাসন চালাতে পারে এবং এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে ডি এম কে-র পত্র চালাচালিও হয়েছে। মন্ত্রীর ঔদ্ধত্য অবিশ্বাস্য। মন্ত্রী এই বিষয়টি সরিয়ে রেখেছে। এই জন্য কি শুধু প্রধানমন্ত্রী দায়ী। কংগ্রেসের অন্য শীর্ষ নেতারা বিশেষত সোনিয়া গান্ধীও কম দোষী নন প্রধানমন্ত্রীর নৈঃশব্দের জন্য। যদি এমন এক শীর্ষ রাজনৈতিক দল এরকম দুর্নীতির সঙ্গে লিপ্ত থাকে, এমন এক ভয়াবহ তথা লজ্জাজনক অবস্থার জন্য দায়ী হয়, তবে আমরা আর কারও ওপর ভরসা রাখতে পারি পরিচ্ছন্ন নেতৃত্বের জন্য? বাইবেলকে আবার উল্লেখ করতে হয়— 'লবণ যদি তার ধর্ম হারিয়ে ফেলে তবে কোথায় আমরা লবণের স্বাদ পাব?'

রাজনৈতিক দল, আমলা, আদালত এমনকী সেনাবাহিনী, মায় মিডিয়া পর্যন্ত আদর্শচ্যুত হয়ে দুর্নীতিপরায়ণ হয় তবে তো জাতির লজ্জায় সীমা থাকে না। এমনকী সরকারি সংস্থা যাদের হাতে তদন্তের ভার ন্যস্ত, তারাও তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে ক্রমাগত।

বর্তমানে আমাদের মধ্যে একজনও মহাত্মা খুঁজে পাই না যে আমাদের দিশা দেবে এবং আমাদের নৈতিক নেতৃত্ব দেবে যা আমরা হন্যে হয়ে সন্ধান করছি। এমনকী আমাদের মধ্যে একজনও জয়প্রকাশ নারায়ণকে খুঁজে পাই না এবং যদিও বা তাঁর সন্ধান মেলে কেউই তাঁর কথা শুনতে আগ্রহী নয়। মানুষ আজ অর্থ, ক্ষমতালাভে পাগল এবং এই দুই বস্তু আমাদের এমনভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে যে, যদি এমন এক পথপ্রদর্শককে আমরা খুঁজেও পাই তবে সে আজ উপহাসের পাত্র। মনে হচ্ছে, দেশ এমন এক নীচে নেমেছে যে তা থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব এবং আম-জনতা যেন এই বিষময় আবহে দমবন্ধকরা অবস্থায় রয়েছে। তাই আমাদের দেশের সমস্ত দলগুলির আত্মসমীক্ষার সময় এসেছে।

এই বিষয়ে বিজেপি-র সঙ্গে আর এস এসেরও এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কংগ্রেস হারিয়ে গেছে। কংগ্রেসের কাছ থেকে আজ কিছুই পাওয়ার নেই— অন্ততঃ গত দু'বছরে যা ঘটেছে। টিভিতে কাদা ছোঁড়া দেখে মনে হয় যেন কেউই তার রুমালের ময়লা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। দলের প্রবক্তারা যেভাবে তাঁদের আঙুল নড়ান তা দেখে মনে হয় তাঁরা কতটা মরিয়া। জাতীয় চরিত্রের এমন অধঃপাত আগে থেকেই চলে আসছিল, কিন্তু দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে তা আরও কুশ্রীরূপে প্রতিভাত হলো। উৎকোচ দেওয়ার মতো দুর্নীতি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তরে প্রবাহমান। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার দলীয় ছাড়পত্র তাদেরই মেলে যাদের কাছে অর্থের প্রাচুর্য রয়েছে। আইন প্রতিনিয়ত ভাঙছে, সম্প্রতি দিল্লিতে নির্মীয়মান সৌধগুলি অবলীলায় ভেঙে পড়তে দেখা যাচ্ছে। আমাদের এর থেকে মুক্তি কোথায়? আমরা কি পুনরায় জনমত জানতে কেন্দ্র, রাজ্যে পুনরায় নির্বাচন ডাকব?

যদি জনগণের উষ্মা কোনও মাপকাঠি হয়, তবে এখনই দুর্নীতিগ্রস্ত ইউপিএ সরকারকে বরখাস্ত করতে হবে। কিন্তু এই দুর্দম বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? এইজন্য এখন প্রতিবাদের সময় এবং এখনই জনসাধারণের সরব হওয়া প্রয়োজন। যদি জনগণ সরব না হয়, তবে কে হবে? স্বাধীনোত্তর ভারতে একবিংশ শতকের প্রথম দশকটি ২০১০ সাল শেষ হবে ইতিহাসে এক স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে। গত আড়াই দশকে মানুষ যেভাবে বঞ্চিত হয়েছে এমনটা আগে কখনও হয়নি। সময়ে এসেছে জনরবকে গুরুত্ব দেওয়ার এবং দেশ তাহলে আবার নূতনভাবে জন্ম নেবে।

তসলিমা ভারত ছাড়ো, আফজল গুরু আগে বাড়ো

শিবাজী গুপ্ত

ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীনীতিন গডকরি স্পষ্ট কথার মানুষ। অপ্রিয় সত্যকে চিনির সিরায় ভিজিয়ে বলতে তিনি নারাজ। পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণে ধৃত মুসলীম সন্ত্রাসী আফজল গুরুকে, সুপ্রীম কোর্ট ফাঁসিতে ঝোলাবার রায় দিয়েছিল ছ' বছর আগে। পর্দার আড়ালে থেকে আর বিজ্ঞাপনে খুবসুরত ছবি ছাপিয়ে যে বিদেশী মহিলা একজন হীনবল ব্যক্তিকে সামনে রেখে দেশ চালাচ্ছে, তাদের হিম্মৎ হলো না সুপ্রীম কোর্টের রায় কার্যকরী করার। এমন এক মহিলাকে প্রেসিডেন্টের গদীতে বসানো হয়েছে, যাকে বিমানবন্দরে আগত বিদেশী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন করতে দেখলে সার্কাসের জোকারের ভূমিকার কথা মনে পড়ে। যাদের দেহের বল নেই, মনের বল নেই, অনেকক্ষেত্রে চরিত্রবলেও ঘাটতি, তাদের পক্ষে দৃঢ়হস্তে শাসনকার্য পরিচালনা করার আশা বৃথা।

সুতরাং কসাইরা ছোলা খাইয়ে খাইয়ে যেমন খাসির চর্বি-বৃদ্ধি করে, তেমনি ফাঁসির আসামী আফজল গুরুকে চর্ব-চোষ্য লেহ্য-পেয় খাবার খাইয়ে তারও গোস্ত চর্বি বৃদ্ধি করিয়ে চলেছে সোনিয়া-মনমোহন সরকার। কারাগৃহের অন্তরালে থেকে তার আদর আপ্যায়নে যাতে কোনও ত্রুটি না হয়, সেদিকে কড়া নজর। একজন ফাঁসির আসামীকে এমন জামাই আদরে পোষে বলেই তাকে কংগ্রেসীদের "Son-in-law" বা জামাই বলাতে কংগ্রেসীদের খুব গোঁসা হয়েছে। নীতিন গডকরিকে তাদের অভব্য গালিগালাজ থেকেই বোঝা যায়, বিজেপি সভাপতি এতদিনে আসল জায়গায় ঘা দিয়েছেন। ফাঁসির আসামীকে জামাই আদরে পোষার এমন বর্বর দৃষ্টান্ত সারা পৃথিবীতে কেউ দেখাতে পারেনি। এ ব্যাপারে ভারতই একমাত্র ব্যতিক্রম। কই গান্ধীর হত্যাকারীকে, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারীকে ফাঁসিতে লটকাতে সরকারের তো তিলমাত্র বিলম্ব ঘটেনি। কিন্তু দুষ্কৃতকারী মুসলমানকে আইনমাফিক যথাপ্রাপ্য শাস্তি দিতে এতো গড়িমসি টালবাহানা কেন? দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুসলমান বলেই নয় কি? দেশের শত্রুর প্রতি সোনিয়া-মনমোহন জুটির নরম মনোভাব দেখেই গডকরি আফজল গুরুকে কংগ্রেসীদের কুলগুরু না বলে 'জামাই' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাতেই কংগ্রেসীরা রেগে লাল হয়ে অনেক অকথা-কুকথা বলছে। আমাদের মনে হয় আফজল গুরুকে কংগ্রেসীদের জামাই না বলে বোনাই বললে তারা খুশী হতো কারণ, শ্বশুর-জামাতা সম্পর্কের চেয়ে শালা-ভগ্নিপতি সম্পর্কে আরও মধুর নয় কি?

এবার আসুন কংগ্রেস সরকারের দুই নম্বর কীর্তিতে। কংগ্রেস রাজত্বে তো এদেশের সীমা-চৌহদ্দী বলে কিছু নেই। সীমান্তিক পবিত্রতা বলে কিছু নেই। সীমা লঙ্ঘনে কোনও অপরাধ নেই। যে ঘরের বেড়া নেই, তার আবার দুয়ারের দরকার কি? জমির বেড়া না থাকলে যেমন গরু-ছাগল যত্রতত্র ঢুকে ফসল নষ্ট করে, ঘরের বেড়া-দরজা না থাকলে চোর-ছেঁচড় কুকুর-বিড়ালও যখন তখন ঘরে ঢুকে পড়ে। ভারতের দশাও তাই। জমি বা বাড়ির মালিকেরই

তসলিমা নাসরিন

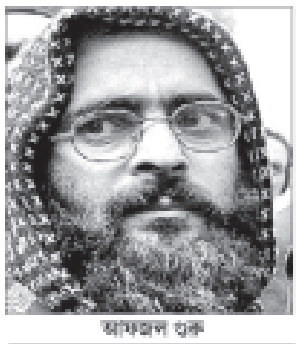

আফজল গুরু

এ ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই। সুতরাং কুকুর বিড়াল চোর জোচ্চোরেরও আগমন নির্গমনে কোনও বাধা নেই।

এ ব্যাপারে কংগ্রেস সরকার সব সময় কিন্তু নির্বিকার নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয়তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তারা ভালো লোক তাড়াতে তৎপর, কিন্তু জঘন্যতম অপরাধে ধৃত আন্তর্জাতিক অপরাধীদের পলায়নে খুবই তৎপর। উদাহরণের অভাব নেই। কোয়াত্রোচি, হেডলি, ভূপাল গ্যাস লীক-খ্যাত অ্যান্ডারসনের নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়। এছাড়া সরকারি গাফিলতিতে কত সংখ্যক সন্ত্রাসী জেহাদী তালিবানি যে প্রেমানন্দে সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছে এবং যদৃচ্ছাক্রমে দেশে ঢুকছে ও বেরিয়ে যাচ্ছে তার হিসাব কে রাখে? সর্বোপরি দু' কোটির উপর বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী দেশে ঢুকে নাগরিক বনে গেছে। এমনকী দিল্লীর বুকেও তারা কংগ্রেসের ভোটের পাল্লা ভারী করছে। সরকার নির্বিকার।

কিন্তু এক বিদেশী মহিলা পরিচালিত ভারত সরকারের যত কু'নজর কুদৃষ্টি আরেক বিদেশী মহিলার উপর— যে প্রাণের দায়ে ভারত সরকারের আশ্রয়প্রার্থী— এদেশে বসবাসের অনুমতিপ্রার্থী। ১২০ কোটি লোকের দেশ ভারতের শাসকগোষ্ঠীর সে হিম্মৎ নেই একজন আশ্রয়প্রার্থী মহিলাকে এদেশে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দানের। শত সহস্র মুসলিম সন্ত্রাসী, মুজাহিদিন, লস্কর তস্কর, জেহাদী ও তালিবানীর দল— যারা এক একটি মূর্তিমান শয়তান, আল্লার সৃষ্ট হিংস্র পশু ও জালিম তাদের কাছে সরকার নতজানু; আর যত নিয়ম-নীতি-আইন কানুনের প্রয়োগ তসলিমা নাসরিনের মতো এক নিরাশ্রয় বিপন্ন মহিলার উপর!

মুসলিম ভোটের ভয় এদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নৈতিক চরিত্র কলুষিত ও দুর্বল করে ফেলেছে। যত নির্বাচন এগিয়ে আসছে, ততই তাদের হাত পা অবশ হচ্ছে, জিভ শুকিয়ে কাঠ হচ্ছে— যদি মুসলিম ভোট না পাই সে ভয়ে। আর দশমাস পরে জনগণের পাইকারী দিদির দৌলতে এবং খোদার দোয়ায় মুসলমানরা যখন রাইটার্স দখল করবে, তখন হিন্দুদের এদেশে বসবাসের জন্য মুসলমানদের কাছে পারমিটের জন্য দরবার ও আবেদন করতে হবে সেকথা মনে থাকে যেন। এখন আলিমুদ্দিনে পার্টি অফিস করে সিপিএম পস্তাচ্ছে, তপসিয়ায় পার্টি অফিস করে তৃণমূল কংগ্রেসকেও পস্তাতে হবে— কিন্তু ততদিনে পশ্চিমবঙ্গের যা সর্বনাশ হবার হয়ে যাবে। আচার আচরণে, ধর্মাচরণে, পদবী বিসর্জনে দিদি তো হাফ-মোল্লা হয়েই গেছে, এখন দলের নামটি "তৃণমূল কংগ্রেস (মোল্লাবাদী)" রাখলেই আল্লা আশমান থেকে বৃষ্টির পানির মতো তার দলের উপর ভোট বর্ষণ করবে। ভোটের জন্য নারীবাদী হলেও নির্যাতিতা নারী তসলিমার জন্য ওকালতি করতে গিয়া তিনি মুসলিম ভোট হারাবেন, তেমন বোকা বাদী নন্।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ : সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫
e-mail : swastika5915@gmail.com vijoy.adya@gmail.com website : www.eswastika.com

RNI No.5257/57
27 December - 2010, Rs. 4.00 only
27/1B, Bidhan Sarani, Kol. -6, Ph. 2241-0603

Swastika
Bengali News Weekly

Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

2011

১৪১৭ JANUARY পৌষ-মাঘ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
একা	31		23rd Netaji Birthday	26th Republic day		1
2	3	অমা	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	একা
16	17	18	পূর্ণি	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

১৪১৭ FEBRUARY মাঘ-ফাল্গুন

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	অমা	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	একা	15	16	17	পূর্ণি	19
20	21	22	23	24	25	26
27	একা	8th Saraswati puja	18th Fateha Doaz Daham	•	•	•

১৪১৭ MARCH ফাল্গুন-চৈত্র

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	অমা	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	একা	17	18	পূর্ণি
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	একা	31	19th Dol Jatra	

১৪১৭-১৮ APRIL চৈত্র-বৈশাখ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1st Yearly Bank A/c	15th Bengali New Year	22nd Good Friday		1	2
অমা	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	একা	15	16
17	পূর্ণি	19	20	21	22	23
24	25	26	27	একা	29	30

১৪১৮ MAY বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	অমা	4	5	6	7
8	9	10	11	12	একা	14
15	16	পূর্ণি	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	একা
29	30	31		1st May Day		

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী

১৪১৮ JUNE জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			অমা	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
একা	13	14	পূর্ণি	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	একা	28	29	30		

১৪১৮ JULY আষাঢ়-শ্রাবণ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31					অমা	2
3	4	5	6	7	8	9
10	একা	12	13	14	পূর্ণি	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	একা	27	28	29	অমা

১৪১৮ AUGUST শ্রাবণ-ভাদ্র

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	একা	10	11	12	পূর্ণি
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	একা	26	27
28	অমা	30	31	15th Independence Day	22nd Janmastami	31st Id-ul-fitr

১৪১৮ SEPTEMBER ভাদ্র-আশ্বিন

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	27th Mahalaya	30th Half Yearly Bank A/c		1	2	3
4	5	6	7	একা	9	10
11	পূর্ণি	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	একা	24
25	26	অমা	28	29	30	

১৪১৮ OCTOBER আশ্বিন-কার্তিক

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	31	2nd Gandhi Birthday	3rd to 6th Durga Puja	11th Laxmi Puja	26th Kali Puja	1
2	3	4	5	6	একা	8
9	10	পূর্ণি	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
একা	24	25	অমা	27	28	29

১৪১৮ NOVEMBER কার্তিক-অগ্র

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
একা	7	8	9	পূর্ণি	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	একা	22	23	24	অমা	26
27	28	29	30	7th Id-uz-zoha	10th Guru Nanak Birthday	

১৪১৮ DECEMBER অগ্র-পৌষ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	6th Muharram	25th Christmas Day		1	2	3
4	5	একা	7	8	9	পূর্ণি
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	একা	22	23	অমা
25	26	27	28	29	30	31

সৌজন্যে সোমক ব্যানার্জী যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৪১১৬৩৫
যে কোনও LIC পলিসি এবং শেয়ারে বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন
এজেন্সি নিয়ে স্বনির্ভর হোন